শিক্ষা-সমালোচনা

শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রণেতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ

অধ্যাপক—বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা
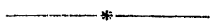
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী

৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯১৪

মূল্য ১৲ এক টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

দুই বৎসর পূর্ব্বে, ১৯১২ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলি ১৯০৭ হইতে ১৯১১ সাল এই পাঁচবৎসরের ভিতর লিখিত হইয়া নানা মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯১০ সালে প্রকাশিত "শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা"য় জানাইয়াছিলাম—দার্শনিক আলোচনা-পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী নির্দ্ধারিত করা হইবে; এবং বর্ত্তমান ভারতোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের অন্তর্গত এই বিভাগের নাম "শিক্ষা-তত্ত্ব" থাকিবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে বিভাগে হাত দিতে পারা যায় নাই।

যতদিন পর্য্যন্ত "শিক্ষাতত্ত্ব" প্রকাশিত না হয়, তত দিন "শিক্ষা-সমালোচনা"র প্রবন্ধগুলিকেই দেশের আধুনিক অবস্থানুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত মাত্র রূপে প্রচার করিতেছি। দ্বিতীয় সংস্করণে একথা বলিয়া রাখা আবশ্যক।

সঙ্কলিত "শিক্ষা-তত্ত্ব"গ্রন্থের সার কথা এবং "শিক্ষা-সমালোচনা"র প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ইতিমধ্যে "শিক্ষানুশাসন" নামে সূত্রাকারে প্রচারিত হইয়াছে। এই দশটি শিক্ষা-সূত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ক। সাধারণ

(১) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য—প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে (ক) চিন্তা-জগতে নব নব সত্যের আবিষ্কারক এবং নূতন নূতন চিন্তা-প্রণালীর পথপ্রদর্শক হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে; (খ) কর্ম্ম-জগতে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক এবং বিচিত্র কর্ম্মকেন্দ্রের নায়ক ও ধুরন্ধর হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

(২) নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের উপায়—শিক্ষার্থীকে কেবল কতকগুলি সদুপদেশ গ্রহণ বা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করাইতে হইবে না। লোকহিতকর ও পরোপকারবিধায়ক বিবিধ কর্ম্মে নিয়োগ দ্বারা প্রথম হইতেই তাহাকে যথার্থ স্বার্থত্যাগী এবং সমাজের প্রকৃত সেবক করিয়া তুলিতে হইবে।

(৩) ধর্ম্মশিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের সুযোগ—(ক) শিক্ষার্থীকে কোনও একজন সুযোগ্য অভিভাবকের সঙ্গে শিষ্য, সুহৃৎ ও সেবকভাবে বাস করিতে হইবে, (খ) সেই অভিভাবকের পরিচালনায় ও ব্যক্তিগত দায়িত্বে শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন এবং ভবিষ্যৎ আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৪) শিক্ষার আন্দোলনে কোন বিশেষ ধর্ম্মমত বা কোনও সম্প্রদায়-গত সমাজ-সংস্কার-নীতি বা কোনও এক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রাধান্য থাকা সঙ্গত নহে। 'প্রাণ-বিজ্ঞানে' বদ্ধমূল এবং 'সমাজ-বিজ্ঞানে' প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষা-বিষয়ক সমুদয় ব্যাপার পরিচালিত করিতে হইবে।

খ। পাঠবিষয়ক

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করিতে হইবে। সাধারণতঃ এক বিষয়ের আলোচনায় অন্যান্য বিষয় শিখিবার সাহায্য হইয়া থাকে। অধ্যাপনাকার্য্যে এই 'পরস্পর-সাপেক্ষ' সম্বন্ধের যথোচিত ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়েই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেও শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে অল্পকালের মধ্যে পরিপুষ্ট ও সর্ব্বতোমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কতিপয় যোগ্য লেখক, অধ্যাপক, ও অনুবাদককে সাহিত্যসেবায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া জীবন অতিবাহিত করাইতে হইবে। এই সাহিত্যসেবিগণের অন্নচিন্তা দূর করিবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে "সংরক্ষণ-নীতি" (Policy of Protection) প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মাসিক অর্থ-সাহায্য করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষার্থীকে কোনও ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিবার নিমিত্ত তাহাকে প্রথম হইতেই সেই ভাষায় মনোভাব প্রকাশ এবং বাক্য রচনা করাইতে হইবে,—কতকগুলি শব্দের বানান ও অর্থমাত্র মুখস্থ করাইতে হইবে না এবং ব্যাকরণের নিয়ম ও সূত্র পড়াইতে হইবে না।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় শিখাইবার

জন্য 'আরোহ-পদ্ধতি'র অধ্যাপনা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ, শিক্ষার্থী প্রথমে জ্ঞাত ও পরিচিত বিষয়সমূহ আলোচনা করিবে, ক্রমশঃ অজ্ঞাত ও অপরিচিত বিষয়সমূহ তাহার আয়ত্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথমে শিক্ষার্থীকে স্থূল পদার্থগুলি সম্যক রূপে জানিতে হইবে, পরে সূক্ষ্ম সত্যে তাহার অধিকার জন্মিবে। তৃতীয়তঃ, প্রথমে বিচিত্র তথ্য পর্য্যালোচনা ও বহুবিধ ঘটনা বিশ্লেষণ করিতে হইবে, অবশেষে জগতের সাধারণ নিয়মসমূহ এবং বিশ্বের শৃঙ্খলা গুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

(৪) ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তিকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে (ফরাসী, জার্ম্মাণ, চীনায়, তিব্বতী, জাপানী ইত্যাদি) এবং মাতৃ ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ আর দুইটি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যে (মারাঠী, বাঙ্গালা, হিন্দী, তামিল, তেলুগু ইত্যাদি) অভিজ্ঞ করিয়া তুলিতে হইবে।

গ। শিক্ষা-সমাজ-বিষয়ক

(১) শিক্ষার্থীর সকল কার্য্যের দৈনিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষার্থিগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে বটে, কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ (ক) শিক্ষণীয় বিষয় গুলির বিভিন্নতা অনুসারে হইবে—যথা ইতিহাসের শ্রেণী, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের শ্রেণী ইত্যাদি ; এবং (খ) প্রত্যেক শিক্ষার পরিমাণানুসারে হইবে—সময়ানুসারে নহে। যথা ইতিহাস বিষয়ের উচ্চ শ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের উচ্চ শ্রেণী, নিম্নশ্রেণী ইত্যাদি।

(২) শিক্ষার্থীকে সমগ্র জগৎই তাহার শিক্ষালয় বিবেচনা করাইতে হইবে। এই নিমিত্ত ভ্রমণ, ব্যায়াম, কষ্টস্বীকার, আরাম কথোপকথন, পরোপকার, উৎসব, সমাজসেবা, ধর্ম্মকর্ম্ম, অধ্যাপনা, শিক্ষাবিস্তার, সঙ্গীত, সাহিত্যপ্রচার প্রভৃতি সকল কর্ম্ম করিবার জন্য শিক্ষার্থীর সুযোগ যথাসম্ভব সৃষ্টি করিয়া দিতে হইবে। কোনও বিদ্যালয়-গৃহের অথবা বিজ্ঞানশালার (ল্যাবরেটরী) চতুঃসীমার মধ্যে শিক্ষার্থীর সাধনা যাহাতে আবদ্ধ না থাকে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং কেবলমাত্র আরাম উপভোগ বা শ্রমবিনোদনের জন্য বহুকালব্যাপী অবকাশ দিতে হইবে না। বিচিত্রস্থানে পরিভ্রমণ, বিবিধ বস্তু পরিদর্শন, দূরদেশে মানবসেবা ও পরোপকার প্রভৃতি কর্ম্মের জন্য এরূপ অবকাশ দেওয়া যাইতে পারে।

এই সংস্করণে প্রবন্ধগুলির ভাষা যথাসাধ্য সরল করা হইল। তথাপি এ সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি থাকিয়া যাওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-সাহিত্যসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ, দেশে প্রচলিত শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে জনগণের চিন্তা প্রবাহিত করা আবশ্যক: শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষালাভের উপকরণ, শিক্ষার্থীর জীবনগঠন,

শিক্ষকের কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে নূতন নূতন আদর্শ ও লক্ষ্য প্রচার করা কর্ত্তব্য। সে গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে হয়ত বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন ও সংস্কার আবশ্যক হইবে। হয়ত এক্ষণে ভাবুক শিক্ষা-প্রচারকগণের চিন্তা স্বপ্ন-রাজ্যেই থাকিবে। সম্প্রতি আমাদের বাস্তব জগতে এই তত্ত্ব সমূহের পরিচয় না পাওয়া যাইতেও পারে। কিন্তু তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। এইরূপ স্বপ্ন প্রচারিত হইতে না থাকিলে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতির পথে চলিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাণ-বিজ্ঞানের নিয়ম সমাজ-জীবনবিষয়ক তথ্যের আলোচনায় প্রয়োগ না করিলে মানবসমাজের গতি সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না। এজন্য ইতিহাসালোচনায় এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের আলোচনায় এই নিয়মগুলি অবলম্বন করিয়াই নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত আমাদের দেশে "ব্যক্তিত্ববিকাশ," "কালোপযোগী," "স্বাভাবিকতা," "জীবন-গঠন-প্রণালী," "আধুনিকতা," "বৈচিত্র্য," "বিশ্ব-শক্তির ব্যবহার," "ভারকেন্দ্রের পরিবর্ত্তন," ইত্যাদি তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ভারতবর্ষে আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভই অত্যল্প হইয়াছে—বঙ্গ সাহিত্যে এ সকল আলোচনা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আরব্ধ হইয়াছে মাত্র। আমাদের পাঠকগণ এখনও সেগুলি বিশেষ আদর করেন না। তথাপি প্রাণ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-বিজ্ঞানের আলোচনায় বঙ্গীয়

সাহিত্যসেবিগণের মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইলে আমাদের শিক্ষা-সাহিত্যের স্তর উন্নত হইবে না।

১৯০৫ সালে ভারতে 'জাতীয় শিক্ষা'র আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই আন্দোলনের সাহায্য কল্পে "শিক্ষাবিজ্ঞান," "শিক্ষা-সমালোচনা," "শিক্ষানুশাসন" ইত্যাদি অকিঞ্চিৎকর শিক্ষা-সাহিত্যের সূত্রপাত। কিন্তু শিক্ষা-সম্বন্ধে লেখকের মত প্রচলিত কোন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া পুষ্ট হয় নাই। দেশের শিক্ষাসম্বন্ধীয় অভাব আলোচনাই এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের এবং এই অসম্পূর্ণ মতবাদের একমাত্র কারণ।

গত দুই তিন বৎসরের ভিতর শিক্ষাসম্বন্ধে নূতন কয়েকটি আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এবং নূতন নূতন কর্ম্মী ও লেখক শিক্ষা-সংসারে দেখা দিয়াছেন। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়, মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে মহোদয়ের সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিস্তার বিষয়ক প্রস্তাব, গবর্মেণ্ট প্রস্তাবিত রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, জেলায় জেলায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক নৈশ শ্রমজীবি-বিদ্যালয় ইত্যাদি এই নূতন আন্দোলনের পরিচয়। এই সকল সম্বন্ধে শুনিয়া ও আলোচনা করিয়া দেশবাসিগণ শিক্ষাপ্রচারের নূতন নূতন আদর্শ, লক্ষ্য ও প্রণালীর ধারণা করিতেছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত শিক্ষাবিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সুধীগণ বিশেষরূপে চেষ্টিত হন নাই।

Modern Review পত্রে বিগত ৬।৭ বৎসরে শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধে নানা রাষ্ট্রীয় আলোচনা বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি নূতন

প্রবর্ত্তিত পাক্ষিক Collegian পত্রেও শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গালা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রাদিতে শিক্ষাসম্বন্ধে যে সকল প্রসঙ্গ বা সমালোচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ ইংরাজী দৈনিক, মাসিক ইত্যাদি পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যেরই অনুবাদ বা উনিশবিশ মাত্র।

এই সকল আলোচনার ফলে দেশের লোক শিক্ষাবিষয়ে নানা কথা শিখিয়াছেন—স্বাধীন ভাবে বর্ত্তমান শিক্ষানীতি সমালোচনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন,—এবং শিক্ষিত মহলে "লোকমত" কথঞ্চিৎ গঠিত হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ক সাহিত্য সৃষ্ট হয় নাই; আংশিক ভাবে তাহার উপকরণ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে মাত্র।

বিগত ২।৩ বৎসর কালের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কতিপয় এল্ টি, বি, টি, উপাধিধারী গ্র্যাজুয়েট বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিলেন তাহা যথার্থভাবে ও স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র তাঁহারা পাইবেন কিনা জানি না। শিক্ষকগণের শিক্ষালাভের ফলে বিদ্যালয়গুলির সত্য সত্যই উন্নতি হইতেছে কিনা সে সংবাদ দেশবাসী এখনও পান নাই। দেশের সাহিত্যেও এখনও তাহার প্রভাব পৌঁছে নাই। বোধ হয় এত অল্প কালের ভিতর তাঁহাদের নিকট বেশী আশা করা উচিত নয়।

আমাদের এই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিজ্ঞানের কতকগুলি সূত্র ও পারিভাষিক শব্দ আয়ত্ত করিবার

জোরেই কেহ দেশের শিক্ষা-সমস্যা মীমাংসা করিতে পারিবেন না। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিশু-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, শিক্ষাপদ্ধতির ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকমহলে জ্ঞান প্রচারিত হইলে আমাদের চিন্তাপ্রণালী নূতন নূতন দিকে ধাবিত হইতে পারে; এবং আমরা হয়ত অনেক নূতন কথা দেশবাসীকে শিখাইতেও পারিব। কিন্তু আমাদের জনগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার করিবার জন্য কেবলমাত্র এই জ্ঞানের অধিকারী হইলে চলিবে না।

যাঁহারা দেশের মাটিকে প্রকৃত শিক্ষাদাতা বিবেচনা করিয়া দেশীয় সমাজের স্বভাব ও অভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন এবং এই উপায়েই ভারতের সাধনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে প্রয়াসী হইবেন, কেবল তাঁহারাই বঙ্গের ও ভারতের যথার্থ শিক্ষা-সাহিত্য ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন।

আগামী ৫।৭ বৎসরের ভিতর এরূপ আদর্শ লইয়া লেখক ও কর্ম্মী দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রে ও সাহিত্য-সংসারে অবতীর্ণ হইবেন। তাহার পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখা গিয়াছে। শিক্ষা-জগতের সেই আদর্শ-প্রচারক ভাবুকগণের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কলিকাতা
চৈত্র, ১৩২০ } শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য ও আনন্দই মানবের উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। এই সৃষ্টিশক্তির বিকাশে সহায়তা করা ও তাহার পুষ্টি বিধান করাই মানবশিক্ষার চরম লক্ষ্য। এজন্য এরূপ ভাবে সমাজে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে মানুষ স্বকীয় শক্তিপুঞ্জের দ্বারা জগৎকে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হয়।

পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ প্রতিষ্ঠালাভ দুই উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—মানসিক শক্তির যথোচিত অনুশীলনের ফলে মৌলিক ও স্বাধীনভাবে বিবিধ সত্য আবিষ্কার এবং নূতন নূতন আলোচনা-প্রণালী উদ্ভাবন দ্বারা চিন্তাজগতে আধিপত্য বিস্তার ; দ্বিতীয়তঃ—নৈতিক জীবনের যথোচিত বিকাশের ফলে বিবিধ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ এবং স্বাধীন ভাবে বিচিত্র প্রতিষ্ঠানের গঠন ও পরিচালনা দ্বারা কর্ম্মজগতে স্বকীয় বিশেষত্বের প্রভাব বিস্তার।

শিক্ষার যেরূপ আয়োজন করিলে এইরূপ আবিষ্ক্রিয়া-শক্তিসম্পন্ন এবং চরিত্রবান্ চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরের উদ্ভব স্বতই হইতে পারে তাহার ইঙ্গিত করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সম্প্রতি সেইগুলি একত্রে প্রচারিত হইল। আমাদের দেশে সত্যের আবিষ্কারক,

এবং কর্ম্মের পরিচালক বহুবিধ লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। আশা করি, সেইরূপ লোক-সৃষ্টির আয়োজনকল্পে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবে।

সংসারে এই দ্বিবিধ প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে কি উপায়ে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন যাপন করা যায়, শেষ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। দেখাইয়াছি গুরুগৃহে বাস ও অধ্যয়ন ভিন্ন এই উদ্দেশ্য সাধনের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে না। সুতরাং আধুনিক ভারতে পুনরায় গুরুগৃহবাস-রীতি প্রবর্ত্তন আবশ্যক। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজেও এই প্রথা অবলম্বিত হইলেই শিক্ষা সমস্যার মীমাংসা হইবে এবং মানবজাতির সংস্কার সাধিত হইবে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণ এই গ্রন্থের প্রুফসংশোধনকালে স্থানে স্থানে ভাষাসম্বন্ধে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা
চৈত্র, ১৩১৮।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ভূমিকা

[শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, এম্‌, এ, সি, এস্‌
কর্ত্তৃক লিখিত]

ইংলণ্ডের কোন কবি বলিয়াছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্বই, পশ্চিম পশ্চিমই—উভয়ে মিলিবে না। কথাটা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতি-পুরুষের ন্যায় এতদুভয়ের ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও বস্তুগত সমতা আছে। মিলিবে না—যুগধর্ম্মের গতিবিধি যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। অন্য কোন নিদর্শন দেখাইবার প্রয়োজন নাই, পশ্চিম ইংলণ্ডের ঈশ্বর দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন, ইহার মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিলেই যথেষ্ট হইবে। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমমুখে যাত্রা করিলে যাত্রার আরম্ভ স্থলেই ফিরিতে হয়। পরমকল্যাণাস্পদ অধ্যাপক বিনয়কুমার এই অবিসম্বাদিত অথচ অননুভূত সত্যের সার্থকতা কার্য্যে উপলব্ধি করিতে ও অন্যকে অনুভব করাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

আমাদের অবনতির কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। বাল্যবিবাহ, পরাধীনতা, স্ত্রীজাতির "কেতাবি শিক্ষার

অভাব ও বৈধব্যে একাদশীর প্রভাব, শুষ্ক মাংসের পরিবর্ত্তে ঝোলযুক্ত অর্দ্ধতরল অন্ন ভোজন, মামলা-মোকদ্দমা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অমনোযোগ, সমুদ্রযাত্রা স্বীকারের শাস্ত্রবিরুদ্ধতা, বৃদ্ধ মনুর প্রবর্ত্তিত বর্ণভেদ, রঘুনন্দন, হাঁচি, টিকৃটিকি ও ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু-ভক্ষণের কুফল-জ্ঞাপন ও তাহাতে বিশ্বাস, ম্যালেরিয়া—"রুচীণাং বৈচিত্র্যাৎ" ইহাদের একটা না একটা, বা একাধিক, কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণগুলির মধ্যে কোনটিতে আংশিক সত্য থাকিতে পারে। কোনটি সম্পূর্ণ অসত্য।

আমাদের সকল প্রকার অবনতির মূলে—ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের ধ্বংসের মূলীভূত কারণ এই একই। ইচ্ছাশক্তির অভাব, বা নপুংসকবৎ দৌর্ব্বল্য, এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবের সহিত কার্য্যকারণ ভাবে নিগূঢ়-সম্বদ্ধ, অথচ সকল উন্নতির মূলে ইচ্ছাশক্তি।

উন্নতি বলিলেই নিম্নস্তর হইতে উচ্চাদর্শে বদ্ধলক্ষ্য হইয়া উচ্চস্তরে আরোহণ সূচিত হয়। পূর্ণ ও অখণ্ড আদর্শের সামীপ্য লাভ করিলে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণতা ও নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। তখন ইচ্ছাশক্তি সাত্ত্বিক, তখন উন্নতি অর্থহীন। তখন অবরোহণ হইতে পারে কিন্তু আরোহণ অসম্ভব!

উন্নতি যখন সার্থক, মানুষ যখন উন্নতির পথে, যখন চক্রবাল-রেখার ন্যায় আদর্শ নিকটবর্ত্তী হইয়াও দূরে সরিয়া যাইতেছে ও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করিতেছে,—সত্ত্বানুবিদ্ধ হইলেও ইচ্ছাশক্তি তখন কামনাবিজড়িত, রাজসিক, তমের অবসাদ ও

নিশ্চলতা অভিভূত করিতে বহুলকার্য্যতৎপর। আমাদের অবসাদ আসিয়াছিল। যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা তাহার নিরাকরণ-কল্পে নানা উপায়ে চেষ্টিত। এই সকল উপায়ের মধ্যে রাধাকুমুদ, বিনয়কুমার প্রভৃতি চিন্তাশীল, অক্লিষ্টকর্ম্মা, ব্রতধারী যুবকগণের অভ্যুদয় অন্যতম।

বিনয়কুমার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উদ্‌যাপন সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, চরিত্রবত্তা, উদ্দেশ্যের উচ্চতা ও সৌন্দর্য্য, প্রগাঢ় দেশহিতৈষণা ও কার্য্যোপ-যোগী পাণ্ডিত্য ও অনুশীলন, বিপুল আশার সঞ্চার করে।

পঁচিশ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ মানুষের পরিপক্ক বহুদর্শিতা জন্মে না। চিন্তার আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্ত বস্তুর স্থান অধিকার করে। সিদ্ধান্তের কতক অংশ পরে পরিত্যক্তব্য বিবেচিত হইলেও, চিন্তার আবেগ ও অন্তরের প্রেরণা ভুলভ্রান্তির ও উপহাসের মধ্য দিয়া তরঙ্গ-ভ্রূকুটির উপেক্ষাকারী অগ্নি-পোতের ন্যায় সত্যের বন্দরে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে।

কোন না কোন কার্য্য করে না এমন লোক নাই বলিলেও হয়। সকল চেষ্টাও সফল হয় না। কিন্তু উৎসাহযুক্ত কার্য্য ও অধ্যবসায়শালিনী চেষ্টার মিলনে উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বরূপ ফলপ্রসব অবশ্যম্ভাবী। বিনয়কুমারের কার্য্য ও চেষ্টার প্রকার দৃষ্টে সে আশা হয়।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকের

পুনরালোচনা এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য নহে। সকল সিদ্ধান্তই যে অভ্রান্ত, বা কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব, তাহাও বলিতে পারি না। তবে শিক্ষা, শিক্ষাপ্রচার ও শিক্ষা-প্রচারকের যে আদর্শ চিন্তিত, চিত্রিত ও অনুস্মৃত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ। উচ্চ আদর্শের বাস্তবীকরণ অনেক স্থলে অসম্ভব হইলেও, তাহার চিন্তা ও অনুসরণ মানব-জীবনকে ধন্য করে, হৃদয়ে বলসঞ্চার করে, জড়তা বিদূরিত করে, কার্য্যকুশলতার সহায় হয়। আদর্শশূন্যতাই বাঙ্গালী-জীবনকে এত ফাঁপা করিয়াছে।

দুইটি মোটা কথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথম কথা, এই পুস্তকে কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গীভূত। কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানার্জ্জন কর, আবার জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি কর ও প্রকার নির্ব্বাচন কর। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান বদ্ধমূল; জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম সুচিন্তিত, বিস্তৃত ও বিচিত্র। কর্ম্মবিরহিত জ্ঞান রক্তশূন্য হৃদ্‌যন্ত্র; জ্ঞান-বিরহিত কর্ম্ম অন্ধকারে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ। সামাজিক জীবনে চরিত্র-গঠন; রাজনৈতিক জীবনে শক্তির পরিচালনা; বিজ্ঞানের জগতে প্রকৃতির গুপ্তাগারে রক্ষিত রহস্য কাড়িয়া লইবার জন্য প্রকৃতির সহিত সম্মুখ-সমর। বিশ্বের নানাজাতীয় কুটিল গ্রন্থিচ্ছেদনপ্রয়াসীর খড়্গের ধারও চাই, ভারও চাই। কথাটা কথঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাষায় বলিলাম, কিন্তু বোধ হয়, পুস্তকের কতক অংশের মর্ম্ম এই। কথাটা ভাল—উন্নতির জন্য, অর্থাৎ রাজসিক বিকাশের জন্য, হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস ইহাই

জ্ঞাপন করে। পুস্তক-বর্ণিত "শিক্ষার আরোহ-প্রণালীর" উদ্দেশ্যও এই। ইউরোপীয় শিক্ষা-বিজ্ঞান-বিদেরা এই মতের সমর্থন করেন।

দ্বিতীয় কথা—বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে। "বিদ্যার অমৃত ভক্ষণ কর", এই উপদেশমাত্র দিয়া বিনয়কুমার নিশ্চিন্ত নহেন। অমৃতভাণ্ড যাহাতে অফুরন্ত হয়, ও সুব্যবস্থিত বণ্টকের হস্তে আপামরসাধারণে যথাযোগ্য পরিবেশন করা হয়, তাহার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ। তাই শিক্ষাপ্রচার ও শিক্ষাপ্রচারক সম্বন্ধে পুস্তকে অনেক সারবান্ কথার অবতারণা হইয়াছে। উদ্দেশ্য মহৎ ও সাধু। কথঞ্চিৎ ফলে পরিণত হইলেও যথেষ্ট উপকার।

অনেক স্থলে আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষাবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসৃত হইয়াছে। ক্ষতি কি? আলোকের মত, জ্ঞানে সকলের সমান অধিকার। শিষ্যের নিকট লইতেই বা দোষ কি? কিন্তু যদিও বিনয়কুমার পশ্চিমমুখে গমনশীল, তাঁহার উদ্দেশ্য সূর্য্যাস্ত-দেশের মণি-রত্ন আহরণ করিয়া নিজের ঘরে ফেরা। সকল জ্ঞান বঙ্গভাষাতেই অর্জ্জন করিতে হইবে। সকল রত্নই বঙ্গসরস্বতীকে সমলঙ্কৃত করিবে। তাঁরি শ্বেতশতদলবিন্যস্ত চরণে সকল অর্ঘ্য সমর্পিত হইবে। শুভ্রজ্যোতির্ম্ময়ী তাঁরি মূর্ত্তি দিগন্ত উদ্ভাসিত করিবে। শুভ্রতড়িৎস্ফুরিত তাঁরি কিরীট মধ্যগগন স্পর্শ করিবে।

ধর্ম্মশিক্ষাসম্বন্ধে পুস্তকে যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা যথার্থই আশাপ্রদ। ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ধর্ম্মশিক্ষার অবান্তর সহায় হইলেও মুখ্য উপায় নয়। তাহার জন্য কর্ম্মের আবশ্যক, নিষ্ঠার আবশ্যক,

সাধনার আবশ্যক, ত্যাগের আবশ্যক, ব্যক্তিগত জীবনের অশেষ বিচিত্রতার মধ্যে একটী চরম লক্ষ্যের জীবন্ত অনুপ্রাণনা ও সর্ব্ব-মুখী প্রভাবের আবশ্যক। সমগ্র জীবনই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। তাহার অনুশীলনের ভিত্তি কোথায়? গুরুগৃহে। তাহার অভিব্যক্তি কোথায়?—বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রত্যেক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে। সাধনা প্রত্যেকের পক্ষে ভিন্ন। সিদ্ধি সকলের এক। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

বিনয়কুমারের সাধু-চেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

সিউড়ি, বীরভূম।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সূচী

শিক্ষা-সমালোচনা

মনুষ্যত্বলাভের সোপান

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রকার আন্দোলন চলিতেছে। শিক্ষাসমস্যা কেবল বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আর আবদ্ধ নয়। ইহার গুরুত্ব সকলেই ক্রমশঃ বুঝিতে-ছেন, এবং ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেছেন। দেশময় এরূপ শিক্ষার আলোচনা অতি আশাপ্রদ। ইহাতে বুঝা যায় আমাদের দেশের লোকেরা ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং শৈশবাবস্থা হইতেই তাহাদিগকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে চালিত করিবার জন্য জাগ্রত হইয়াছেন। অভিভাবকগণ দুই একজন শিক্ষকের হাতে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছুক নন; বরং নিজে নিজেই এই কঠিন বিষয়ের যতটুকু মীমাংসা করিতে পারেন, আগ্রহের সহিত তজ্জন্য সময়-ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন।

শিক্ষাপদ্ধতি ও অন্নসংস্থান

আমাদের অনেকেই শিক্ষালাভকে টাকা রোজগারের উপায় হইতে তফাৎ করিতে পারেন না। তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষাকে কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনের পন্থাই মনে করেন। এজন্য অর্থকরী না হইলে তাঁহারা কোন বিদ্যার মূল্য স্বীকার করেন না। এই নিমিত্ত শিক্ষাসংক্রান্ত সকল বিষয়ই ঐদিক্ হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কয়টা চাকরীর পথ আছে—কি কি ব্যবসায় অবলম্বন করার সুযোগ আছে—কোন্ কোন্ পথ অবরুদ্ধ নয়—কেবল এ সব প্রশ্নের বিচার করিয়া তবে শিক্ষার প্রশ্নে হাত দেন। কিন্তু এ ভাবে দেখিলে শিক্ষাপদ্ধতি অতি নীচ জিনিষ হইয়া পড়ে। ইহার প্রকৃত স্থান অতি উচ্চ। কেবল টাকা রোজগারই শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য নয়, অথবা সমাজে বৈষয়িক উন্নতি ও প্রতিপত্তিই ইহার একমাত্র লক্ষ্য নয়।

অবশ্য মানুষ যখন শরীরী, তখন শরীর-ধারণের জন্য আর্থিক উন্নতির দরকার আছে। এইজন্য যে শিক্ষাপদ্ধতিই অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহা শিক্ষার্থীর সমস্ত ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের সঙ্গে মিলাইয়া করিতে হইবে। বাল্যকালের শিক্ষায় যে ফললাভ হয়, তাহার সাহায্যেই জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যের জন্য উপযোগিতা লব্ধ হইয়া থাকে। এদিকে গার্হস্থ্যাশ্রমে অন্নচিন্তা একটি প্রধান চিন্তা—একমাত্র চিন্তা নয়। অতএব শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যতের খাওয়া-পরার কথাটারও মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত

হওয়া যাইতেছে, সেই অবস্থায়ই অর্থ-সঞ্চয়ের উপায়টাও দেখা উচিত। তাহা না দেখিতে শিখিলে ছাত্রের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিল।

সুতরাং ভবিষ্যতে জীবন কোন্ কাজে সমর্পণ করা হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করা কর্ত্তব্য। তাহার পর তদনুসারে অভিভাবকগণকে সন্তানসন্ততির শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে বিজ্ঞানে বা ইতিহাসে এম্ এ পাশ করিয়া অথবা গণিত-শাস্ত্রে মৌলিক অনুসন্ধান ও স্বাধীন গবেষণা করিবার জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পরে ডেপুটীগিরি বা ওকালতি করার মত একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিবে! যদি বিজ্ঞানচর্চ্চাই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হয়, তবে, বলা বাহুল্য, তদ্দ্বারাই যতটুকু বিষয়সম্পত্তি হইতে পারে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এইরূপ আদর্শ থাকিলে ছেলেবেলা হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। এইরূপ লক্ষ্য থাকিলেই ছাত্রগণের নিকট বিজ্ঞান কেবল একটা বাজে জিনিষ বা পুঁথিগত বিদ্যা বা বিজ্ঞানাগারের পরীক্ষা মাত্র না হইয়া প্রকৃত জীবন্ত সত্যরূপে মনে স্থান পাইতে পারে। সেই শিক্ষাই সুখপ্রদ—ইহাতে মস্তিষ্কের অল্প সঞ্চালনেই জ্ঞানলাভ অধিক হয়।

অতএব টাকা-পয়সা রোজগার বা খাওয়া-পরার কথাটাকে একেবারে উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বরং শিক্ষালাভকেই তাহার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। এজন্য ছাত্রজীবনকে একটা "পোষাকী" জীবন বিবেচনা না করিয়া পরজীবনের অর্থাৎ

গার্হস্থ্যাশ্রমের স্বাভাবিক সোপানের মত দেখিতে হইবে। যাহাতে বাল্য জীবনের সঙ্গে প্রবীণ বয়সের একটা ঘনিষ্ঠ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, শিক্ষা-পরিচালকগণকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে শেষ লক্ষ্য স্থির না করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে বিদ্যার্জ্জনেও আন্তরিকতা থাকে না, আর অর্থোপার্জ্জনও মনের মত হয় না।

পাঠদ্দশায় কর্ম্মজগতে আধিপত্য-বিস্তারের আয়োজন

আর একপ্রকার লোক আছেন যাঁহারা লেখাপড়াকে কেবল অর্থোপার্জ্জন ও খাওয়া-পরার সহায় মাত্ররূপে আদর না করিয়া মনুষ্যত্ববিকাশের উপায় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেন, তাহা অনেক সময়ই গ্রহণীয়; কিন্তু মানুষের পরিপূর্ণ জীবন কিসে বিকশিত হয় তৎসম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা আছে কি না সন্দেহ। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদা বই পড়া, বা লেখাপড়ার আলোচনা করা, ডিবেটিং ক্লাব বা আলোচনা-সমিতির জন্য রচনা লেখা বা প্রবন্ধ পাঠ করা ইত্যাদি তাঁহাদের মতে ছাত্রদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কাজ করিবার শক্তির বিকাশ এবং বৃদ্ধি হওয়াও যে ছাত্র-জীবনেই আবশ্যক তাহা অনেকের মনে থাকে না। বুঝা উচিত যে, কেবল কতকগুলি সুন্দর ভাব গ্রহণ করিলেই শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য সাধিত হয় না। ভিন্নভিন্ন-চরিত্রবিশিষ্ট বহুলোকের সঙ্গে মিলিয়া

বহুবিধ বাধাবিপত্তি ও মতভেদ প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়া স্থিরচিত্তে কাজ করিতে শিক্ষা করাও আবশ্যক। এজন্য প্রথম হইতে কার্য্যকরী শক্তিগুলির অনুশীলন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ছাত্রদিগের জন্য বিচিত্র কর্ম্ম-ক্ষেত্র এবং স্বাধীন ক্রিয়াশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগস্থল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া শিক্ষাগুরুদের কর্ত্তব্য। এইরূপে কর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে হইতেই শিক্ষার্থীর স্বভাব দৃঢ় ও কার্য্যতৎপর হইয়া উঠে। প্রকৃত নৈতিক উন্নতি অন্য কোন উপায়ে সাধিত হইতে পারে না। অনেকের সঙ্গে এক দলে প্রবেশ করিয়া একই উদ্দেশ্যে কাজ করিতে হইলে যত সহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার ও দূর-দৃষ্টিত্বের প্রয়োজন হয়, আর কিছুতেই তাহা হয় না। পুঁথির সদুপদেশ বা বক্তৃতার বলে মানুষকে এ সব গুণ শিখান যায় না। এজন্য এমন কর্ম্মক্ষেত্রের আবশ্যক, যেখানে বালকেরা স্ব স্ব অবস্থা ও সামর্থ্যানুসারে নিজ নিজ চিন্তা ও কর্ম্ম দ্বারা কোন-কিছু গড়িয়া তুলিবার সুবিধা পায়। ছাত্রাবস্থায় এইরূপ কার্য্য করার ফলে ভবিষ্যতে দলবদ্ধ ভাবে কোন বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা মানুষের পক্ষে সহজ হয়। এমন কি, এই প্রণালীতে প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে স্বাধীন কর্ম্মের অনুকূল আবেষ্টনে পরিণত করিতেও শিক্ষার্থী প্রস্তুত হইতে থাকে।

বস্তুতঃ মানসিক বৃত্তিগুলিকে বাহিরের কর্ম্মে প্রয়োগ করিবার সুবিধা না থাকিলে মানসিক শক্তিরও বৃদ্ধি হয় না। মন ক্রমশঃ হীনতেজ ও পঙ্গু হইয়া যায়। কারণ আবেষ্টন ও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পোষণোপযোগী রস গ্রহণ করিতে পারিলেই মন সবল, দৃঢ় ও

সজীব হয়। দায়িত্বের কাজ করিতে করিতেই দায়িত্বগ্রহণের শক্তি জন্মে। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা কেবল তাহাই, যাহাতে মনকে ভাবে ও চিন্তায় পরিপূর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই চিন্তা ও ভাবরাশিকে কার্য্যে পরিণত করিবারও ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

মনুষ্যজীবনে ত কেবল ভাবেরই আদান প্রদান করিতে হয় না—অনেক কর্ম্মও করিতে হয়। পরিবারে ও সমাজে থাকিতে হইলে অনেক কষ্ট ও ক্ষতিস্বীকার করিয়া চলিতে হয়—অনেক পরোপকারের প্রয়োজন হয়। সেই কঠোর কর্ত্তব্যময় জীবনের জন্য যে সময়ে মানুষকে প্রস্তুত করা হইতেছে—তখনই অর্থাৎ এই পঠদ্দশাতেই সংসারের যাবতীয় কাজে মানুষের মনোনিবেশ করান আবশ্যক। তাহা না হইলে ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত হওয়া যায় না, পরে ভুগিতে হয়—সামান্য সমান্য বিষয়েও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। আর ছাত্রজীবনেই কর্ম্ম করিবার সুযোগ পাইলে আর একটা প্রধান লাভ হয়। প্রথম হইতেই স্বাধীন কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা হইয়া থাকে। তাহার ফলে ভবিষ্যতে অনেক লোককে একমতে আনিয়া সকলের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া বড় বড় কাজ করিবার যোগ্যতা জন্মে।

আমাদের দেশের লোকেরা কাজ করিবার এই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে তত আদর করেন না; এমন কি, ইহাকে শিক্ষালাভের কোন অঙ্গের মধ্যেই গণ্য করেন না। এইরূপে শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য ও কষ্টজনক হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যা গ্রন্থগত জিনিষ মাত্র বিবেচিত হয়—যেন জীবনের প্রতিদিনকার কাজের

জিনিষ নয়। আমাদের ছাত্রেরা সর্ব্বদা সকল সমাজে যে কোন অবস্থায় অর্জ্জিত বিদ্যা ব্যবহার করিতে অসমর্থ! পরীক্ষাগার আর গ্রন্থের সম্মুখে না বসিলে অথবা খাতা বা পুঁথির কোন্ জায়গায় কথাটা আছে ঠিক বাহির করিতে,—"localise" করিতে না পারিলে তাহারা মহাবিপদে পড়িতে থাকে। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়—জ্ঞান মনের অঙ্গীভূত না হইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রতিদিনকার কাজ-কর্ম্ম ও জীবন-যাপনের সঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়া-বিদ্যার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সংসার-যাত্রা এক পথে চলে—বিদ্যালাভ অন্য পথে চলে। এ জন্যই ইতিহাসের উপদেশে আমাদের মনে ঔৎসুক্য জন্মাইতে পারে না, ভূগোল অতি শুষ্ক নীরস বিষয় বলিয়া মনে হয়, সংস্কৃত শিক্ষার দরকার নাই অনেক ছাত্রেরই এরূপ ধারণা হইয়াছে। অনেকই হয়ত গণিতের "লেখা অঙ্ক"কে বাঘের মত ভয় করে। কেননা এই সকল বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই— এই ভাবে ছাত্রের শিক্ষালাভ হইয়াছে।

স্বাধীন চিন্তার সুযোগ বিধান

আর বই-পড়া সম্বন্ধেও অনেকের তত স্পষ্ট ধারণা নাই। লেখাপড়াই তাঁহাদের মতে ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা হওয়া উচিত। কিন্তু কি উপায়ে তাহাই প্রকৃত শিক্ষার উপকরণ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে অনেকেই চেষ্টা করেন না। শিক্ষার্থী স্বাধীন চিন্তা করিতে না পারিলে যে অন্যের প্রচারিত মনোভাব নিজের

চিত্তে স্থান লাভ করিতে পারে না, তাহা বুঝা উচিত। কেবল উদরসাৎ করিলেই শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না। শরীর পুষ্ট করিতে হইলে খাদ্যকে রক্তমাংসরূপে পরিণত করা চাই। এ জন্য শরীরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। সেইরূপ মনকে স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে অবসর না দিলে বই-পড়ার সার্থকতা বা পরকীয় উপদেশ-গ্রহণও সম্ভবপর হয় না।

এতদ্ব্যতীত, স্বাধীন চিন্তা করিতে না পাইলে মনোবৃত্তির বিকাশই হয় না। সর্ব্বদা যদি চর্ব্বিতচর্ব্বণ বা পরস্ব আওড়াইতে হয়, তবে ধীশক্তির সঞ্চালন হয় কখন? তাই এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে ছাত্রগণ নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়া যথার্থ উপকার লাভ করিতে পারে। অতএব কেবলমাত্র অন্যে কি বলিতেছে—বা অমুক ব্যক্তির কি মত—শুধু ইহাই বুঝিয়া বা জানিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক বিষয়েই—ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস—প্রত্যেক জ্ঞাতব্য ব্যাপারেই মনুষ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডারে 'আমারও কিছু অর্পণ করিবার আছে' এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য। এই স্বাধীন-চিন্তার বিকাশই শিক্ষালয়েরও আদর্শ হওয়া উচিত।

এইরূপ স্বাধীন-চিন্তার উদ্রেক না করিয়া দিতে পারিলে শিক্ষার আয়োজনকে প্রশংসা করা যায় না। তাহা ছাড়া নিজ দেশের, জাতির ও সমাজের সভ্যতা, ইতিহাস ও রীতিনীতি শুধু পরের কাছে বিদেশীয় গ্রন্থে পড়িয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে।

'নিজে স্বদেশের ইতিহাসকে সত্যভাবে আলোচনা করিব, যথার্থ ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান করিয়া আমাদের এই স্বতন্ত্র সভ্যতার গৌরব-কথা উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইব'—এ লক্ষ্য যদি ছাত্রদের না থাকে তাহা হইলে শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না, শিক্ষালয়ের আদর্শকেও উচ্চ জ্ঞান করিতে পারি না। যদি দাক্ষিণাত্যের কথা বা মহারাষ্ট্রীয় কবিদের রচনা বা তামিল ও তেলুগু ভাষার প্রসঙ্গ ভারতবাসীর কাছে নিউ জীল্যাণ্ডের বর্ত্তমান সভ্যতা বা পেরুর পুরাবৃত্তের মত অপরিচিত বোধ হয়, তবে যতই দেশে "রিসার্চ্চস্কলার" বা বৃত্তিভুক্ পণ্ডিতের বৃদ্ধি হউক না কেন, যতই এম্-এস্-সি, পি-এইচ্-ডি ডিগ্রীধারীর সৃষ্টি হউক না কেন, যতই রাষ্ট্রবিজ্ঞানাদি বড় বড় দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা চলিতে থাকুক না কেন, দেশের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, ভিত্তিহীন ও বিজাতীয় এ কথা বলিতেই হইবে। স্বদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসই উন্নত শিক্ষালাভের লক্ষণ।

শিক্ষায় স্বদেশী

অতএব দেখা গেল, স্বাধীন-ক্রিয়া-শক্তি ও স্বাধীন-চিন্তাশক্তির উদ্রেক করিতে না পারিলে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, এবং শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ববিকাশের উপায় বলা যাইতে পারে না। এজন্য সকল দেশের সকল সময়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে দেশীয় প্রণালীতে গঠন করা প্রয়োজন। কারণ ছাত্রের চিত্তে কতকগুলি

ভাব ও ধারণা স্বভাবত জন্মাবধিই রহিয়াছে। তাহা বুঝা এবং তাহার সদ্ব্যবহার করা শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য। বিদেশীয় প্রথায় বা একেবারে অপরিচিত বস্তুর সংশ্রবে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। দেশের মধ্যে যে নিয়ম ও আদর্শ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, শিক্ষাপ্রণালী তাহার উপযোগী না হইলে বালক সরস ভাবে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। শিক্ষার্থীর উপর জোড়াতালি দিয়া একটা পরকীয় চিন্তারাশির স্তূপ অথবা কৃত্রিম শিক্ষার বোঝা চাপান হয় মাত্র! তাই দেশকে যত জায়গায় উপলব্ধি করা যায়—ধর্ম্ম, সমাজ, রীতিনীতি, তীর্থ, শিল্প, কারুকার্য্য, মেলা, উৎসব, মহাপুরুষ—সকলের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষাসঙ্ঘ-গঠন

এজন্য আর একটা জিনিষের দরকার। দেশীয় লোকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালিত হওয়া উচিত। অন্য লোকেরা যত শুভাকাঙ্ক্ষীই হউন না কেন, তাঁহাদের মনের গতির সঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তির মিল কখনই হইতে পারে না। এক-জাতি অপর জাতির হৃদয়ের কথা ভাল রকম বুঝিতে পারে না। তাই হাজার সদিচ্ছায় কাজ আরম্ভ করিলেও পরে কাহারও কাজ করিয়া সুখ দিতে পারে না। স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অভাব আপনারাই মোচন করিয়া লইতে না পারিলে মনের মত ফল পাওয়া যায় না।

আর পরে করিয়া দিলে অন্যান্য কতকগুলি অসুবিধাও আছে। কারণ সমস্ত জাতির শিক্ষার ভার দেশের লোকের হাতে রাখিতে যে শক্তির দরকার, তাহার অনুশীলনও শিক্ষার একটা প্রধান জিনিষ।

সুতরাং প্রকৃত 'মানুষ' তৈয়ারী করিতে হইলে বাল্যাবস্থায়ই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং অতি স্বাভাবিক ও সহজভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করাইতে হইবে। এজন্য যে শিক্ষাসঙ্ঘ শিক্ষার্থীকে সমাজের যাবতীয় চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে এবং স্বদেশের জাতীয় আবেষ্টনের মধ্যে থাকিবার সুবিধা করিয়া দেয়, এবং তরুণ বয়সেই কর্ম্মের উপর আধিপত্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জন্মায় সেইরূপ প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করা আবশ্যক।

চিন্তায় মৌলিকতা

ছাত্রজীবনকে ভবিষ্যৎ জীবনের সোপানের মত দেখা উচিত। অতএব পঠদ্দশায়ই অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে জীবিকা অর্জ্জনের শিক্ষাও হওয়া চাই। এদিকে কাজের অনুষ্ঠানের মধ্যে না থাকিতে পারিলে ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ হয় না; এবং প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের জন্য ক্ষতিস্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিবার আয়োজনও আবশ্যক। তাই সমাজ ও দেশের বিবিধ কার্য্যে প্রত্যেক ছাত্রেরই মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। অতএব যাহাতে পরার্থে কিছু কিছু সময় দান করা যায়, এরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান ছাত্রজীবনের শিক্ষার প্রধান উপকরণ।

প্রাণ-বিজ্ঞানের নিয়ম

আবার কেবল পরের উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্গীরণ করিতে পারাই উচ্চ শিক্ষার লক্ষণ নয়। নিজের চিন্তাশক্তি দ্বারা নিজের উপযোগী করিয়া লইতে না শিখিলে পরকীয় কথাগুলি মনে বসে না। সেই অবস্থায় বিদ্যা জীবনের জিনিষ না হইয়া বাহিরের জিনিষ বলিয়া বোধ হয়। যে উপায়ে লেখাপড়া করিলে,—কেবল পরের কথা দ্বারা চালিত হইতে হয় না, বরং সেই সকলকে নিজস্ব করিয়া লইবার

সুযোগ পাওয়া যায় এবং তাহাদের উপর স্বকীয় বিশেষত্বের ছাপ মারিতে পারা যায়,—অধিকন্তু স্বকীয় চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়া স্বাধীন ক্ষমতার বিকাশ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি বাহিরের যত শক্তি আছে, জীব-জগৎ যদি কেবল তাহাদের ক্রিয়া-ক্ষেত্র ও অভিনয়ের ভূমি মাত্র হয় এবং প্রতিক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া স্বকীয় ব্যবহারে প্রযুক্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে আর তাহাকে জীবন্ত বলা যায় না। কেবল আদান বা গ্রহণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল না। প্রকৃত জীবনের প্রধান লক্ষণ প্রদান করিবার ও শক্তি। শিক্ষার্থীর বাহিরে যে ভাবরাশি রহিয়াছে, আমাদের আবেষ্টনে যত শক্তির অভিনয় হইতেছে, সংসারে মনুষ্যত্ব-বিকাশের যত উপাদান আছে,—গ্রন্থ, পুস্তকাগার, প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি সকল প্রকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক কেন্দ্রের সাহচর্য্যে ও সংঘর্ষে স্বকীয় জীবন-গঠনের অনুরূপ শক্তি সংগ্রহ করিতে উপযুক্ত ও সমর্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের মনকে কেবল মাত্র অপরের ক্রীড়াপুত্তলী না হইতে দিয়া, সচেষ্ট ভাবে এই সব শক্তি ও ভাবসমষ্টির উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারা আবশ্যক।

স্বাধীন চিন্তা বিকাশের উপায়

মনকে এরূপ কর্ম্মঠ ও সজাগ করার প্রধান উপায়—যখনই যা পড়ি বা শুনি সেই পড়া বা শুনা জিনিসের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা থাকা। কেবল বিদ্যাভ্যাস কেন, পৃথিবীর সমস্ত কাজের

সুসাধনের জন্যই তৎপ্রতি আন্তরিকতা আবশ্যক। প্রত্যেক কাজকেই তাহার নিজের জন্য আদর করিতে না পারিলে, তাহাতে তন্ময় না হইলে তাহার প্রতি সমুচিত যত্ন করা হইল না। লেখাপড়াও যদি তাহার নিজের জন্যই আদৃত হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপ না হয়, তবেই ইহার দ্বারা প্রকৃতভাবে চিন্তাশক্তির অনুশীলন হইতে পারে।

(১) আলোচ্য বিষয়ে তন্ময়তা

আমি ভাষা শিক্ষা করিতেছি, কিন্তু ভাষাশিক্ষার ফলে সমাজে আমার কিরূপ স্থান হইবে অথবা ইহাতে যথেষ্ট টাকা রোজগার হইবে কি না, সর্ব্বদা যদি এইরূপই ভাবি, তবে ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে যত চেষ্টা, যত পরিশ্রম ও যত ইচ্ছার দরকার তাহা কখনই হইতে পারে না। এ স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে চাই আমি মান-সম্ভ্রম বা টাকাপয়সা;—ভাষাশিক্ষা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যদি অন্য কোন উপায়ে এ সব জিনিষ পাওয়া যাইত, তবে ভাষাশিক্ষারূপ ধৃষ্টতা হয়ত ছাড়িয়াই দিতাম। এরূপ অবস্থায় ভাষার প্রতি অনুরাগ থাকিতে পারে না এবং নিজের একটুকু ভাবিবার প্রবৃত্তিও জন্মিতে পারে না। কেবল পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পাইবার মত যথেষ্ট জ্ঞান হইলেই হইল,—তজ্জন্য আত্মশক্তির অনুশীলন যে করিতে হইবেই এমন কোন কথা নাই! তাই ইতিহাসই পড়ি বা বিজ্ঞানই আলোচনা করি, এই ইতিহাস বা বিজ্ঞান জীবনের উদ্দেশ্য না হইয়া অপরবিধ উদ্দেশ্যের অধীন হইলে অন্যে যে

ভাবে বুঝায় সেই ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা হয়, নিজের প্রয়োজন মত বুঝিবার দরকার আছে মনে হয় না। কারণ সে রকম বুঝায় বিশেষ কিছু লাভ নাই। অথবা পরের উপদেশই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হয়, তাহার উপর যুক্তিতর্কপ্রয়োগের পরিশ্রম কষ্টকর বোধ হয়।

অতএব যে বিষয়ই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করা যাউক না কেন, সেই বিষয়ই ছাত্রাবস্থার পরেও, ভবিষ্যতেও আলোচনা করিতে হইবে, এই আদর্শে জীবন আরম্ভ করা উচিত। তবেই পঠদ্দশায় নিজের মৌলিকতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ইচ্ছা হইবে। ছাত্রজীবনে জগতের ইতিহাসকে নিজের চোখে দেখিতে চেষ্টা করিতে পারা যাইবে। নিজে বৈজ্ঞানিক হইতে প্রয়াস জন্মিবে। বাহ্য জগতের সমস্ত দৃশ্য ও শ্রাব্য পদার্থের প্রতি চক্ষু কর্ণ ধাবিত হইতে থাকিবে, এবং তাহাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্তি হইবে। স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে পরকীয় মতের অপেক্ষা না করিয়া প্রকৃত সত্য নির্ণয় করিতে নিজেই যত্নবান হইতে পারা যাইবে।

(২) আলোচিত বিদ্যাই অন্নসংস্থানের উপায় হওয়া আবশ্যক

তাই 'লেখাপড়া শেষ করিয়া উকীল হইব বা ডেপুটি হইব' এ ভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়, বরং 'যে বিদ্যা আরম্ভ করা গেল তাহারই আলোচনায় জীবন কাটাইব' এরূপ ভাবিলেই

শিক্ষণীয় বিষয়ের যাথোচিত আদর করা হয়। অধিকন্তু 'এই উপায়ে যত টাকা রোজগার হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব' এরূপও ভাবিতে হইবে। কারণ অন্য উপায়ে খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষা মনের ভিতর প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাজে জিনিষের প্রতি মন আকৃষ্ট হইলে বা বড় বড় চাকরী বা অন্য কোনরূপ প্রলোভনের জিনিষ সর্ব্বদা চোখে থাকিলে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ শিথিল হয়—চিত্ত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, বিজ্ঞান বা সাহিত্য সমস্ত চিন্তাশক্তির কেন্দ্রস্থলে থাকে না, বিদ্যালাভে তন্ময়তা জন্মে না। কিন্তু কিরূপে ছাত্র লেখাপড়াকে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মনে না করিয়া জ্ঞানবিকাশের উপায়-স্বরূপ বিবেচনা করিতে পারে? যাহারা এই জ্ঞানের দ্বারাই জীবনের সকল প্রকার সার্থকতালাভ হইল এইরূপ ভাবিতে পারে। বলা বাহুল্য, তাহারা অন্নচিন্তার মীমাংসাও সেই সঙ্গেই করিয়া রাখে। ধনাগমের উপায় ও আদর্শ-সম্বন্ধে প্রথম হইতেই লক্ষ্য স্থির না করিয়া লইলে বিদ্যাভ্যাসের সময় সকল বিষয়ে আন্তরিকতা থাকে না; এবং স্বকীয় মতামত প্রকাশপূর্ব্বক প্রকৃত সত্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা এবং স্বাধীন চিন্তা শক্তির প্রয়োগ করা অসম্ভব হয়।

(৩) পরীক্ষা-পদ্ধতির বিশেষত্ব

'ছাত্রজীবনে যে শিক্ষা লাভ করিলাম, সেই শিক্ষা দ্বারাই ভবিষ্যৎ জীবনের সকল প্রকার কর্ত্তব্য সাধন করিব'—এরূপ ইচ্ছা

কাজে পরিণত করিতে হইলে শিক্ষা-ব্যবস্থার আরও কিছু বিশেষত্ব চাই। শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে পরীক্ষার পদ্ধতি একটী প্রধান জিনিষ। পরীক্ষার নিয়মের ভাল মন্দের উপর সুশিক্ষা কুশিক্ষা নির্ভর করে।

যদি এরূপ নিয়ম থাকে যে, সমস্ত বৎসর লেখা পড়া না করিয়াও শেষ কয়েকমাস অত্যন্ত পরিশ্রম করিলেই বেশ খ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহা হইলে ছাত্রদিগের ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিকে সহায়তা করা হয়। তাহা নিবারণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এই জন্য যে উপায়ে প্রতিদিনকার বিদ্যাভ্যাস উৎসাহিত হয়, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা দরকার। কেবল বৎসরান্তে তিন চারি দিনের পরীক্ষাকে প্রধান বিবেচনা করা উচিত নয়। দৈনিক কাজের পরীক্ষার ফলও গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহাতে ছাত্রেরা স্বাভাবিক ভাবেই নিয়মিত রূপে কাজ করিতে বাধ্য হয়।

অনেক সময় আবার এরূপও দেখা যায় যে, ছাত্রেরা বিদ্যাচর্চ্চাকে উদ্দেশ্য না করিয়া পরীক্ষাকেই লেখাপড়ার লক্ষ্য করিয়া ফেলে। তখন প্রকৃত জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি থাকে না, পরীক্ষার প্রশ্ন প্রভৃতির প্রতিই মন আকৃষ্ট হয়। পরীক্ষা জ্ঞান ও বুদ্ধি মাপিবার একটী উপায় মাত্র না থাকিয়া বিদ্যালাভের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়ে। পরীক্ষার নিয়ম এরূপ দোষাবহ থাকিলে নিজ শক্তির প্রতি মনোযোগী হইবার সুবিধা জুটে না।

তাহার উপর, পরীক্ষা দ্বারা ছাত্রকে ঠকাইবার অভিসন্ধি যদি থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত জ্ঞানের বিচার করা হইবে না।

শিক্ষার্থীর যথার্থ শিক্ষা কতটুকু হইল, কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণই না করিয়া সে নিজে কিছু বলিতে বা লিখিতে পারে কি না, তাহা স্থির করাই শিক্ষাপরিচালকগণের কর্ত্তব্য। এজন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে ছাত্রেরা ভুল করিবার ভয়ে জড় সড় না হইয়া মন খুলিয়া নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস পায়।

পরীক্ষার নিয়ম অন্যরূপ হইলে জ্ঞানবিকাশের সহায়তা না হইয়া বিঘ্ন জন্মে—বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা-নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পড়ায় এবং তদতিরিক্ত গ্রন্থ বা out-books পড়ায় একটা বিরোধ আছে মনে হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে প্রবৃত্তি হয়। একটুকু বাজে বই পড়িতে গেলেই ভয় হইয়া থাকে, পাছে পরীক্ষার জন্য মাপা পড়ার কিছু ক্ষতি হইল! কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মানসিক উন্নতির জন্য দুই প্রকার গ্রন্থ পাঠই সমান দরকারী। বিদ্যালয়ের বই ছাড়া দুচারখানা বই বেশী পড়িলে মনোবৃত্তির যে বিকাশ হয়, তাহা কেবল পরীক্ষার ফলের জন্য কেন, সকল সময়েই কাজে লাগে।. একই মন নানা উপকরণে গঠিত হইতেছে। তবে আর এ বই, ও বই, কাজের বই আর বাজে বই বলিয়া তফাৎ করি কেন?

পরীক্ষার নিয়ম যদি এত দূষণীয় থাকে যে, মনোবৃত্তির বিকাশের বিচার না করিয়া মুখস্থ করার শক্তিরই পরিচয় লওয়া হয়, সেই অবস্থায় "টেক্‌ষ্ট বুক" পড়াই একমাত্র লাভ-জনক "paying study" বোধ হইবে। কিন্তু প্রশ্ন এমন সুন্দররূপে করা যাইতে পারে যে, তাহার দ্বারা শিক্ষার্থীর বয়ঃক্রম অনুসারে

বুদ্ধির যতটুকু বিকাশ আশা করা যায়, সেই পরিমাণ বিচার করার সম্ভাবনা থাকে। এ নিয়মে নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাদি না পড়িয়াও, অথবা কিছু কম পড়িয়াও, বা পড়া না থাকিলেও ছাত্রেরা নির্ভয়ে পরীক্ষায় উত্তম ফল পাওয়ার আশা করিতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলেই পরীক্ষকগণ বুদ্ধির বিচার না করিয়া স্মরণশক্তির প্রমাণ গ্রহণ করেন মাত্র। এজন্য বিদ্যার্জ্জনের সময় ছাত্রের চিত্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, বাঁধা পথ ছাড়া নূতন পথে চলিতে তাহার স্বভাবতই ভয় হয়।

অনেক সময় ছাত্রেরা যে বলিয়া থাকে "ঐ উপন্যাসটা বা নাটকটা পড়েছিলাম—কিন্তু পরীক্ষা দেবার মত করে পড়িনি"—তাতে বোঝা যায় যে, পরীক্ষার জন্য পড়া আর জ্ঞানের জন্য পড়ার উপায় দু'টী পৃথক্। এটা ভুল,—পরীক্ষার জন্য পড়ার কোন বিশেষত্ব থাকা উচিত নহে। যখন যাই পড়ি না কেন, সবই প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য; তবে ইহার কোনটীতে যদি পরীক্ষাই দিতে হয়, তাহার জন্য বিশেষ প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু এজন্য পরীক্ষার নিয়ম এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে জ্ঞানেরই বিচার করা হয়। তাই বলিতেছিলাম স্বাধীন-চিন্তার বিকাশ পরীক্ষা-প্রণালীর উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে।

(৪) গ্রন্থ-নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে বস্তুজ্ঞানের উৎসাহ-প্রদান

পরীক্ষায় কূটপ্রশ্ন না করা বা কোন না কোন উপায়ে ছাত্রকে ঠকাইবার মতলব না থাকা যেমন প্রকৃত বিদ্যাচর্চ্চার সহায় এবং

স্বাধীন-চিন্তার উদ্দীপক, তেমনি দুইখানা চারিখানা বাঁধা বই ঠিক না করিয়া দিয়া জ্ঞান-রাজ্যের অন্তর্গত বিচিত্র বস্তুর আলোচনায় সাহায্য করাও মৌলিকতা এবং স্বাবলম্বনের প্রধান উপায়। অবশ্য ছাত্রের বস্তুজ্ঞান জন্মাইবার জন্য শিক্ষকের পারদর্শিতা অত্যন্ত আবশ্যক। কখন কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায় পড়া উচিত, অথবা কোন্ বিষয়ের পর এবং কোন্ বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে কোন্ পদার্থের আলোচনা করা উচিত, এ সব স্থির করিবার ক্ষমতা শিক্ষকগণের থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও বয়সানুসারে বিদ্যাদান করিতে পারা যাইবে।

এই রূপে বস্তুজ্ঞান জন্মিতে থাকিলে শিক্ষার্থীর বৃত্তিগুলি অতি স্বাভাবিক ও সহজভাবে প্রস্ফুটিত হয় এবং চিত্ত বেশ কর্ম্মঠ ও চিন্তাশীল হয়। ইহাতে ছাত্র আলোচিত বিষয়টা প্রস্তুত না পাইয়া নিজেই ধীরে ধীরে তৈয়ার করিয়া লইতেছে, এরূপ মনে হয়। এ উপায়ে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয় বিষয়ও যেন শিক্ষার্থীর সম্মুখে ক্রমে বিকশিত হইতে থাকে। এ নিয়মে মুখস্থ করার প্রবৃত্তি আদৌ হইতে পারে না; বরং ধী-শক্তির সঞ্চালন ভিন্ন এক ধাপও অগ্রসর না হওয়ায় চিত্ত অতি স্বাভাবিক ভাবে ও সহজে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় এবং স্বাবলম্বী হয়। আর বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বই কোন্ পদ্ধতিতে লিখিতে হয়, এবং সংসারের জ্ঞেয় বস্তু ও পদার্থ-গুলি আলোচনা করিবার শৃঙ্খলা, সমস্তই শিক্ষা হইতে থাকে। ইহাতে এক বিদ্যার সঙ্গে অপর বিদ্যার কি সম্বন্ধ অতি সহজেই স্থির করা যায়।*

পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই যে পরস্পর-সম্বন্ধ, এবং সকল বিজ্ঞানই যে অতি স্বাভাবিক ভাবে সংলগ্ন, তাহা প্রমাণিত হইয়া পড়ে। ইতিহাসের সঙ্গে জড়-বিজ্ঞানের, এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সঙ্গে মনো-বিজ্ঞানের ও সমাজ-বিজ্ঞানের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হয়। ব্যাপক ভাবে সকল পদার্থ আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এবং তাহার সুবিধাও থাকে। তখন গণিত শিক্ষা না করিলেও চলে, কিংবা ইতিহাসে কেবল মারামারি কাটাকাটির কথাই থাকে, অথবা বর্ত্তমান কালে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষার দরকার নাই, এরূপ অসঙ্গত কথা বলিতে পারা যায় না। বস্তুজ্ঞানের প্রভাবে ছাত্রেরা স্বতই দেখিতে পারে যে, বার্কের ফরাসী-বিপ্লববিষয়ক গ্রন্থে যে সত্য প্রচারিত হইয়াছে, ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং মনো-বিজ্ঞানেও সে সত্যই আর একভাবে অন্য সংশ্রবে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তখন যে কয়টী বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ না দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়তাই করে এরূপ বুঝিতে পারা যায়।

বাস্তবিক পাঠ্যতালিকা-নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাবলীর অত্যাচার উঠাইয়া দিলে অথবা কিছু হ্রাস করিলে, চিন্তা-শক্তির যথেষ্ট উদ্রেক হয় এবং স্বাবলম্বনের ইচ্ছা বাড়িতে থাকে। তাহাতে কোন বিষয় এই বইতে পড়িয়াছি বা ওই তথ্যটা অমুক বিজ্ঞান-গ্রন্থের অমুক অধ্যায়ে আছে এরূপ চিন্তা করিতে হয় না। বরং সেই তত্ত্ব নিজ মনেরই অমুক স্থান অথবা মস্তিষ্কের অমুক প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া আছে এবং অন্যান্য সত্যের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে গ্রথিত রহিয়াছে, ধারণা

হইবে। ইহাতে সমস্ত জ্ঞান এবং সকল প্রকার সত্যই নিজস্ব হইয়া যায়—কিছুই পড়াবিদ্যা বা বইয়ের কথা মাত্র বোধ হয় না। নিজের মনটাই এই বিশ্বের ন্যায় সকল তত্ত্বের মৌলিক ভাণ্ডার-রূপে কাজ করে। স্বাধীন চিন্তাই এরূপ শিক্ষা-প্রণালীর প্রাণস্বরূপ।

অতএব চিন্তায় স্বাধীনতা ও মৌলিকতার উদ্রেক করাইতে হইলে, শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি ছাত্রের অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মান আবশ্যক। এই জন্য ছাত্রের উচিত বিদ্যাশিক্ষাকে অন্য কোন জিনিষের উপায় মনে না করিয়া তাহার নিজের জন্যই আদর করা। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক যাহাতে শিক্ষাই ভবিষ্যতে পরিবার-পালন এবং জীবিকা-অর্জ্জন প্রভৃতি যাবতীয় কর্ত্তব্য-সাধনের সুবিধা করিয়া দেয়। অধিকন্তু, পরীক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে ছাত্রগণ জ্ঞানের ও বিদ্যারই পরিচয় দিতে পারে।

আর, নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ-তালিকার অধীনতা স্বীকার না করিয়া জ্ঞেয় জগতের বস্তু সমূহের আলোচনা করিলে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এজন্য দুইখানা চারিখানা পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছাত্রের হাত পা বাঁধিয়া না দেওয়াই ভাল। তাহার পরিবর্ত্তে যে যে লেখকদিগের রচনায় আলোচ্য বিষয়টীকে নানা দিক্ হইতে বিচার করা হইয়াছে, তাঁহাদের পুস্তকগুলি হইতে সঙ্কেত ও সাহায্য গ্রহণ মাত্রের অনুমোদন করাই সঙ্গত।

চরিত্র-গঠনের উপাদান—মানবসেবা

আমাদের দেশের লোকেরা যে যে অবস্থায় আছে, প্রত্যেককে সেই অবস্থার উপযুক্ত সমাজহিতকর কাজ করিতে হইবে। কেবল অবিবাহিত, সন্ন্যাসী, ফকীর ও ভবঘুরের দলের দ্বারা সমস্ত কাজ সাধিত হইবার নয়। ছাত্র, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আছে।

ছাত্র-জীবনে পরোপকার

"ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ" বটে, কিন্তু ছাত্র ত কেবল এক আলমারি বই নয়! ছাত্রেরা কেবল ছেলে নয়, তাহারা মানুষ। অতএব বাল্যকালের কর্ত্তব্যপালনের মধ্যে মনুষ্যোচিত কার্য্যও করিতে হইবে। কষ্ট এবং বিপদের মধ্যে থাকিয়াও স্বভাবকে চঞ্চল হইতে না দেওয়া,—নানা প্রকার লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নিজের খুঁটী না ছাড়া, পরোপকারী হওয়া, বুড়োদের মত ছাত্রদেরও কর্ত্তব্য।

ছাত্রজীবন ত চিরকাল থাকিবে না—অচিরেই প্রত্যেককে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরিবার, সমাজ ও দেশের গুরুভার বহন করিতে হইবে। সেজন্য ত ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। দেশসেবা যদি বৃদ্ধ বা প্রবীণদেরই কাজ হয়,—

তাহার জন্যও ত শিক্ষা দরকার। তাই পঠদ্দশায় দশের কাজে মন দিলে অধ্যয়নের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং ছাত্রেরা ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ অল্প বয়স হইতেই স্বার্থত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হইলে, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব-বিকাশেরই সুবিধা ঘটিবে।

গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি

অনেকে বলেন বিবাহিত লোকদের দেশহিতৈষিতা পোষায় না। এ কথার যে মানে কি, তাঁহারাই বলিতে পারেন। সংসারীদের ধর্ম্ম কি কেবল টাকাপয়সা রোজগার করা, আর পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা? নিজ ও নিজের পরিবারের ভাত কাপড় যোগান ত কর্ত্তব্যই। গরু-ছাগলও এই ধরণের কাজ করিয়া থাকে। সন্তান-সন্ততির মঙ্গলকামনা, পশু-মানুষ, দুই জীবই করে। তবে মানুষের বিশেষত্ব থাকিল কোথায়? যে লোক পশুর সমান না হইয়া মানুষ হইতে চাহে, তাহার কর্ত্তব্য নিজের পরিবার-পালনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অন্যান্য লোকেরও যতদূর সম্ভব হিতসাধন করা। "নিজেদের পেটই চলে না, তা আবার পরোপকার!" এরূপ ভাবিলে মানব-জীবন সার্থক হয় না। অতি সামান্য ধনাগম হইলেও, তাহারই কিয়দংশ পরের জন্য গচ্ছিত রাখা কর্ত্তব্য। মানুষের দৈনিক কাজের তালিকায় এবং দৈনিক খরচের হিসাব-বহিতে, পরের কাজে কিছু সময়দান ও পরের সাহায্যে কিছু অর্থদানের

ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। 'আগে পরিবার পালন করা যাক্, তাহার পর যদি সময় থাকে ও কিছু বাঁচে, দশের জন্য খরচ করা যাবে'—এরূপ ভাবিলে যত বড় ধনীই হউন না কেন, পরের জন্য কিছু বাঁচাইতে পারা যাইবে না। তাই সময়ের ও আয়ের কিয়দংশ পরের জন্য দিতেই হইবে ঠিক করিয়া সংসারকর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া দরকার। পারিবারিক জীবনের মত সামাজিক জীবনের জন্যও ব্যবস্থা করিতে প্রত্যেক মানুষই ধর্ম্মতঃ বাধ্য। সমাজ যখন সংসারীদের লইয়াই গঠিত, তখন সমাজসেবা ত তাহাদেরই প্রধান কর্ত্তব্য। জ্বালা, যন্ত্রণা, অভাব, কষ্ট সংসারীদের সর্ব্বদা ভোগ করিতে হয় সত্য। কিন্তু এই অবস্থায়ই সমগ্র সমাজের ভবিষ্যৎ সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে।

সন্ন্যাসাশ্রম ও স্বদেশ

ফকীরদের আবার স্বদেশ-বিদেশ কি? তাঁহারা—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর?"

—এই ভাবিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং "আস্‌মান্‌কা তল আর জমীন্‌কা উপর" নিজের ঘর বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাছে জাতীয়তা—স্বদেশহিতৈষিতা ত আশা করাই উচিত নহে। তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য দিনরাত ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁহারা নিম্নস্তরের এক ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া

অনেক ঊৰ্দ্ধে অবস্থিত। তবে কোন দেশের ও সমাজের সংস্কার-সাধন না হইলে অনেক সময়ে সংসার হইতে ধর্ম্মভাবের লোপ পাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, এবং মানুষ বিষয়ভোগাদি নীচ-চিন্তায় মনপ্রাণ কলুষিত করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত উচ্চ আদর্শ বর্জ্জন করিতে পারে। এই আশঙ্কায় বহুক্ষেত্রে সন্ন্যাসাশ্রমের মহাত্মারা দেশের রাষ্ট্রীয় এবং বৈষয়িক আন্দোলনেও যোগদান করিয়া থাকেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সাংসারিক উন্নতির সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হন না।

পল্লী-জীবনে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা-সঞ্চার

স্বদেশের সকল কার্য্যে যেমন সকল প্রকার ও সকল অবস্থার লোকেরই সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন, তেমনই দেশের সর্ব্বত্র সকল স্থানেই সেই চেষ্টার কার্য্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বড় বড় সহরের কয়েকজন ধনী বা শিক্ষিত লোকেরা সমাজের জন্য খাটিলে বা ভাবিলে বেশী ফল পাওয়া যাইবে না। প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক লোকের মধ্যে পরোপকারের বাসনা এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার আশা ও উপায়ালোচনা সংক্রামিত করিতে হইবে। কেবল যেখানে অধিক লোকের সমাগম হয় বা ব্যবসাবাণিজ্যের কলকোলাহল খুব বেশী, যেখানে সরকার বাহাদুরের বিবিধ আফিস ও কর্ম্মকেন্দ্র লোক-বৃন্দকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া রাখিয়াছে, কেবল সেই সকল জায়গায় ব্যবসায়ের আন্দোলন বা শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা বা বিজ্ঞানচর্চ্চা বা রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্রগঠন

হইলে দেশের প্রায় সমস্ত লোকই এ সব বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ থাকিয়া যাইবে। যেখানে অতি নিস্তব্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া গরুবাছুরদের সঙ্গে নিরীহস্বভাব লোকেরা শ্রমবিনোদন করিতেছে, যেখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন সময়ই কোন চিন্তার ও উদ্বেগের কারণ উপস্থিত হয় না, সকলেই শান্তির সহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধা করিতেছে, যেখানে সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর এখনো বেশী প্রবেশ করে নাই, যেখানে হিন্দু-মুসলমান একমন একপ্রাণ হইয়া পাড়ার সমস্ত কাজই করিয়া থাকে, যেখানে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা এখনো প্রবিষ্ট হয় নাই, সকল লোকই পূর্ব্বপুরুষদের চিরন্তন প্রথা প্রত্যেক সামাজিক ও পারিবারিক কাজেই বজায় রাখিবার জন্য যত্নবান্, যেখানকার আম-কাঁঠাল বনের দেবমন্দির হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা এখনও অপসৃত হয় নাই—সেই সুখের নীড়, শান্তির আধার, এবং সরলতা স্বাভাবিকতা স্বাধীনতার নিকেতন আমাদের পল্লীসমাজে নূতন নূতন কথা শুনাইয়া জনগণের চিত্তে এক অভিনব ভাব ঢালিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের শান্তিময় কুটীরাবাসে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, কষ্টভোগ, ক্ষতি-স্বীকার ও কার্য্য করিবার বাসনা প্রবেশ করাইতে হইবে। সামাজিক ও অপরাপর সকল আন্দোলন দ্বারা তাহাদের চিত্তের বিক্ষোভ জন্মাইতে হইবে। দেশের কোথায় কোন্ চিন্তা, কোন্ কাজ হইতেছে—এ সব কথা তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া, এই আধুনিক পৃথিবীর নূতন অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গ্রাম্য-

জীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। গ্রামের সঙ্গে সহরের যে বিরোধ কিছুকাল হইল ঘটিয়াছে এবং এজন্য পল্লীতে যে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সমস্তই প্রতীকার করিতে হইবে। এ জন্য ঘরে ঘরে—হিন্দু-মুসলমান, কৈবর্ত্ত-ব্রাহ্মণ, জোলাতাঁতী সকলকে চরিত্র-গঠনোপযোগী শিক্ষাদান পূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালন ও অধিকার-স্থাপনের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে হইবে।

সমাজসেবার বিবিধ সাধন

এই নানা জায়গায় নানা লোকের এককালীন কাজ করিবার ভাল রকম বন্দোবস্ত আমাদের দেশে এখনও হয় নাই। সকল কাজই যেন খাপছাড়া বা পরস্পর-বিরোধী। দেশের সকল লোককে কোন এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা এখনও বেশী করা হয় নাই। এক্ষণে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনোভাব প্রত্যেককে জানাইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে কর্ম্ম-বিনিময় ও আনাগোনা করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিতে হইবে। পূর্ব্বকালে রেলগাড়ী, টেলিগ্রাম, ডাকঘর যখন ছিল না, তখন তীর্থযাত্রী, সন্ন্যাসী, ফকীর বা ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে ভাবের আদান প্রদান করিতেন এবং ঐ উপায়ে পল্লীবাসিগণ অতিদূর দেশের সংবাদ ও আচার-ব্যবহার জানিতে পারিতেন। এখনকার রেলগাড়ী ও খবরের কাগজের দিনেও সেই "স্বদেশী" ছাঁচের চিন্তা ও কর্ম্মের আদান প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

১। প্রচারক ও আচার্য্য

এজন্য জেলায় জেলায় সমাজবিজ্ঞান-প্রচারকের দরকার। তাঁহারা সহরের চিন্তা ও কাজের তালিকা পল্লীতে লইয়া যাইবেন। তাঁহাদের পর্য্যটনে ও পল্লীসেবায় পল্লীবাসীদিগের শিক্ষকতার কার্য্য হইবে। আবার তাঁহারা পল্লীর অবস্থা সহরকে শুনাইয়া নূতন তথ্য, নূতন আলোচ্য বিষয় ও অভিনব সমস্যা প্রদান করিয়া উপযুক্ত ধুরন্ধরগণের কাজে সহায়তা করিবেন। তাঁহারা নিজেদের প্রাণের কথার সঙ্গে এবং হৃদয়ের আবেগ ও স্বভাবের দৃঢ়তার সহিত সাময়িক পত্রিকার রচনাবলীকে সজীব করিয়া তুলিবেন। প্রচলিত পত্রিকাসমূহের লেখাগুলি এ উপায়ে কেবল বইএ-পড়া জিনিষ বা দায়িত্বহীন মাথাপাগলা লোকের বিকার-বচন না হইয়া এক মহাসত্যরূপে সকলের চিত্তে স্থান পাইবে।

আর, এইরূপে পাড়ার সঙ্গে পাড়ার, সহরের সঙ্গে গ্রামের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সহানুভূতি ও একপ্রাণতা বর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র দেশ ও সমাজকে একীকৃত করিবে। তাহাতে কোন্ ব্যক্তির কি কর্ত্তব্য, সমাজ-কলেবরের কোন্ অঙ্গের কি কার্য্য, কোথায় কোন্ বস্তুর অভাব, এ সব অতি স্বাভাবিক ও সহজ নিয়মেই স্থির হইয়া যাইবে। তাহার ফলে, এমন কি সংবাদপত্র যদি উঠিয়াই যায়, তথাপি কোন ভয়ের বা দুঃখের কারণ থাকিবে না। এই পর্য্যটকেরাই আরও হৃদয়গ্রাহিভাবে দেশের লোককে কৃষি স্বাস্থ্য শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে পারিবেন।

তাঁহারা ঘরে ঘরে আন্দোলন লইয়া গিয়া সমস্ত জাতির হৃদয়ে নবশক্তি সঞ্চার করিবেন। এ কাজ সকলের পক্ষেই সম্ভব—সন্ন্যাসী, সংসারী, ছাত্র, যুবা, বিবাহিত, অবিবাহিত, প্রত্যেকে এ কাজ অনায়াসেই করিতে পারেন। এরূপ সেবাকার্য্যে হৈ চৈ নাই, স্থিরভাবেই সকলের কর্ত্তব্য উপদেশ দেওয়া যাইতে পারিবে। যাঁহারা এই কর্ম্ম করিবেন তাঁহাদের নৈতিকচরিত্রও দৃঢ়রূপে গঠিত হইতে থাকিবে।

২। আলোচনা ও লোকশিক্ষা

আর সর্ব্বত্রই কথকতা-সভাসমিতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজ করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া বক্তৃতা বা লোককে বুঝাইবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। দেশের সমস্ত লোকই যদি কোনদিন 'কেজো' হইয়া উঠেন, তবুও মিটিং বা সম্মিলন করিবার দরকার থাকিবেই। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় দেশের বিচিত্র কথা বলিয়া বেড়াইবার এবং পরহিতব্রতে সকলকে দীক্ষিত করিবার সুযোগ সৃষ্টি সর্ব্বদাই করিয়া চলিতে হইবে। বড় বড় সম্মিলন বন্ধ হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে অসংখ্য সভাসমিতি ও সমাজের অবস্থা আলোচনা করিবার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহাতে বাক্যব্যয় কম হইলেও কাজ বেশীই হইবে। চরিত্রগঠনের এ সকল উপায় অবলম্বন না করিলে জাতীয় জীবন অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত উচ্চ শিক্ষায় কোন উপকার সাধিত হইবে না।

অনেকে বলেন সভাসম্মিলনে কেবল হৈ চৈ হয়, কাজ কিছুই হয় না। এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। তাঁহাদের অধিকাংশ-স্থলেই দশের জন্য কোন কিছু করিতেই অপ্রবৃত্তি, এবং নিজের ছেলেদের স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে অনিচ্ছা। এই যে কংগ্রেস কেবল তিন দিনের জন্য পয়সাওয়ালা উকীল ব্যারিষ্টারদের আমোদপ্রমোদ বা বিশ্রম্ভালাপের একটা আড্ডা বলিয়া সর্ব্বদা তিরস্কার করা হয়, এই তিন দিনের সম্মিলন হইতেই, আর কিছু কাজ হউক্ বা নাই হউক্, আমাদের যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষা হইয়াছে, আমাদের অশেষ উপকার হইয়াছে, আমরা আমাদিগকে চিনিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়াছি, আমাদের কোথায় কে কি ভাবেন, কে কি করেন, কোন্ ব্যক্তির কত সাহস, কত কার্য্যনৈপুণ্য, সব বুঝিতে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে।

স্কুল-কলেজের অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে কংগ্রেস নানা উপায়ে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। মানবসেবা, সমাজসেবা, দেশ-সেবা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ কংগ্রেসের সাহায্যেই আমাদের শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান চরিত্রগঠন বিষয়ে কংগ্রেসের কৃতিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। এই মহাদেশের সমস্যাকে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ জীবনের সমস্যা বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমরা একটা ভারতীয় লোকমত তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইতেছি। দেশের সমস্ত কাজেই এই প্রকাণ্ড দেশের জন-সাধারণ এক মত বা এক অমত প্রকাশ করিতে পারিতেছে। আর এ উপায়ে সমবেত চেষ্টার দ্বারা কার্য্য

করিবার উপায় পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। অধিকন্তু, আজকাল যে 'জেলাসমিতি'র অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহাতে বাজে কাজ, নিরর্থক বক্তৃতা অনেক হয় সত্য; কিন্তু ফলতঃ সহরে পল্লীতে সংযোগ দৃঢ় হইতেছে, দু'য়ে হৃদয়ের বাঁধন শক্ত হইতেছে। এই সকল সম্মিলন-আন্দোলনের সুফল কিছুই হয় নাই, এমন বলা যায় না। আধুনিক সময়ে কর্ত্তৃপক্ষও আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

৩। কর্ম্মকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান

অবশ্য কেবল মাত্র বক্তৃতা বা সভায় চরিত্র গঠিত হইবে না। তাহার জন্য দেশের সর্ব্বত্র, নানা ধরণের, নানা উদ্দেশ্যে কর্ম্ম-কেন্দ্র চাই। তাহাদের সাহায্যে বক্তৃতার বা বইএর উপদেশগুলি হাওয়ায় উড়িয়া যাইতে পারিবে না। এই গুলিকে কাজের ভিতর দিয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরিয়া রাখা যাইবে। কোথাও বা শিল্পোন্নতির জন্য, কোথাও বা সাধারণ লোকশিক্ষার জন্য, কোথাও বা সমাজসংস্কারের জন্য, কোথাও বা ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠান-গঠন আবশ্যক। এরূপ ছোট বড় অনেক দল বাঁধা প্রয়োজন। এ সব দলে সকলে মিলিয়া, মিশিয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়া একই উদ্দেশ্যে জীবন গঠন করিতে শিখিবে। দেশবাসিগণ তাহার মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের ক্ষেত্র পাইয়া নিজ নিজ নৈতিক ও মানসিক বৃত্তি বিকাশের সুযোগ পাইবে।

এ সকল কেন্দ্রে আর একটা প্রধান শিক্ষা হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহাদের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য থাকেন। অধিকন্তু তিনি সর্ব্ব বিষয়ে আলোচনা ও বিচার করিবারও অধিকারী হন। এইরূপে কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং অধিকার-ভোগ যুগপৎ চলিতে থাকে। তাহার ফলে দায়িত্ববোধ এবং চরিত্রবত্তা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যায়।

আরোহ-পদ্ধতির অধ্যাপনাপ্রণালী

নূতন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—(১) আবিষ্কার (২) আরোহণ

এতদিন আমাদের দেশে যে ভাবে ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনাকার্য্য চলিতেছিল, তাহার যথোচিত পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর অবতারণা করিতেই হইবে। এক কথায় বলিতে হইলে, যে প্রণালীতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিয়া পরিচিত তথ্য হইতে ক্রমশঃ অপরিচিত ও অজ্ঞাত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারে; বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা হৃদয়ঙ্গম, এবং নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাইয়া স্বকীয় সৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে; এবং যে প্রণালীতে আলোচ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের ক্রমবিকাশ শিক্ষার্থীর স্বকীয় ক্রমবিকাশের অনুরূপ হইতে পারে, এরূপ শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক।

আবিষ্কারকের জীবন ও কার্য্যপ্রণালী অনুকরণীয়

বৈজ্ঞানিকেরা এবং নানাবিধ তত্ত্বের আবিষ্কারকেরা ভ্রম

সংশোধন করিতে করিতে অনেক অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য এবং অসত্যের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া, ধীরে ধীরে দু'একটী খণ্ড তত্ত্ব সংগ্রহের পর শেষে সম্পূর্ণ সত্যের দুর্গ করতলগত করিয়া থাকেন। ছাত্রকেও ঠিক সেই ভাবে আবিষ্কার করিতে করিতে, অজানা পথের ভিতর দিয়া, অনেক ব্যর্থ প্রয়াসের পর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে। অপর লোকেরা যে সকল সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই সত্যসমূহ অবলম্বন করিয়া যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ছাত্রকে সেই সকল সত্য স্বীকার করাইয়া দেওয়ান এবং পুস্তক সকল আবৃত্তি করান শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে কেবলমাত্র ছাত্রের পথ-প্রদর্শকের ন্যায় থাকিয়া তাহার সত্য আবিষ্কারের প্রয়াসে সহায় হইতে হইবে।

তবে শিক্ষার্থী ছাত্র এবং প্রথম আবিষ্কারকের মধ্যে একটা গভীর প্রভেদ আছে। প্রকৃত আবিষ্কারককে অসহায় ভাবে পৃথিবীর আদিম অবস্থায় একাকী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অন্ধকারে চলিতে যাইয়া অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এ জন্য বহু ব্যক্তির জীবনব্যাপী এবং নিঃস্বার্থ ও ফললাভে নিরাকাঙ্ক্ষ কর্ম্মের ফলে এক একটী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণে বহুজীবন নিরর্থক ব্যয়িতও হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রকে এরূপ ব্যর্থযত্ন হইতে হইবে না। বহু জাতি ও বহু ব্যক্তির প্রয়াসপ্রসূত, জড়জগৎ ও চিজ্জগতের সত্যসমূহ তাহার নিকট বিজ্ঞানাকারে সঞ্চিত ও পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। তাহার শিক্ষক এই ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া সর্ব্ব-বিদ্যারক্ষকরূপে সর্ব্বদা তাহার

সহায়তা করিতেছেন। যে যে পন্থা অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সত্য সকল উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই সকল উপায় এখন শিক্ষার্থীকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে না। তাহার শিক্ষকের মনেই সেই প্রণালীগুলি সর্ব্বদা রহিয়াছে। সুতরাং বহু যুগে পৃথিবী যাহা লাভ করিয়াছে, ছাত্র এক জীবনেই এখন তাহা লাভ করিতে সমর্থ। ছাত্রের জীবন কোন কোন সুপণ্ডিতের জীবনের ন্যায় নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা নাই।

শিক্ষা-পদ্ধতিতে গ্রন্থপাঠের স্থান

শিক্ষার্থী আবিষ্কারক, কেবলমাত্র পাঠক নহে। গ্রন্থকারেরা নিজ নিজ পুস্তক রচনা করিবার জন্য তথ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। শিক্ষার্থীকে ঠিক সেই প্রণালীতে পুস্তক পাঠ অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে না। তাহাকে পুস্তক-প্রণেতার আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে না—আবিষ্কারকগণ যে পথে চলিয়া থাকেন, ছাত্রের সেই পথেই চলিতে হইবে। আবিষ্কার এবং গ্রন্থ-লিখন—এই দুইএর প্রণালী স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ যে প্রণালীতে পুস্তক রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার প্রয়াস-সমূহের বিবরণ থাকে না—তিনি বহু গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন অথবা যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তগুলি অন্যান্য ব্যক্তির সিদ্ধান্তসমূহের সহিত মিলাইয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেন। ইহাতে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি এবং গৌরব সাধিত হয়। কিন্তু

পাঠক আবিষ্কারের কৌশল ধরিতে পারে না—গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার যে যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন সেই সাধনার অবস্থা বুঝিতে পারা যায় না।

সিদ্ধান্তগুলি পাইয়া শিক্ষার্থীর সন্তুষ্ট থাকিলে চলে না,—তাহার পক্ষে ফললাভ অপেক্ষা ফল লাভের উপায় জানা অধিক আবশ্যক। এজন্য অতি সুপণ্ডিত-রচিত পুস্তকও শিক্ষার প্রথম স্তরে শিক্ষার্থীর উপযোগী নহে। অন্যান্য বিবিধ কারণে গ্রন্থসমূহের সারমর্ম্ম, রচনাকৌশল এবং লিখন-পদ্ধতির সহিত ছাত্রের পরিচিত হওয়া উচিত। কিন্তু কোন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য গ্রন্থ-পাঠের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। এজন্য ছাত্রকে যদি পুস্তক পাঠ করিতেই হয়—তাহা হইলে ছাত্রদিগের ব্যবহারের জন্য বিশেষ ভাবে পুস্তক রচনা করা কর্ত্তব্য। যে সকল পুস্তক দ্বারা ছাত্র স্বকীয় উন্নতি অনুসারে স্বাধীনভাবে ক্রমশঃ কঠিনতর ও জটিলতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বাধ্য হয়, যে সকল পুস্তকে সঙ্কেতমাত্র নির্দ্দিষ্ট থাকে, উপায় ও পন্থা মাত্র বলিয়া দেওয়া হয়, এবং সকল কার্য্যই শিক্ষার্থীকে নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমাধা করিতে হয়, সেই সকল পুস্তকই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদিগের পাঠ করা উচিত।

আবিষ্কারকের প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীনচেষ্টা, মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই উপায়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মস্তিষ্কের সঞ্চালন করিলে মানসিক শক্তির বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হয়। অনুশীলনই শক্তির উপায়—

কষ্ট ও সমস্যার ভিতর থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিলেই শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। এজন্য অপরের আবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠগুলি পূর্ণ না করিয়া নিজে বিচার্য্য বিষয়গুলির জটিলতা ও দুরূহতা সরল করিবার চেষ্টা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

পৃথিবীর বৈচিত্র্য-পর্য্যালোচনা

নানা উপায়ে সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। আবিষ্কারপ্রণালী এক নহে—বহু। শিক্ষালাভের সময়ে ছাত্রের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা বিধেয় ? যাহা দ্বারা শিক্ষার্থীকে বহুবিধ বিশেষ বিশেষ তথ্য ও ঘটনা আলোচনা করিতে হয়—সেই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলেই ধীশক্তির সবিশেষ বিকাশ হইতে পারে। কারণ এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া নানাবিধ বাস্তব তথ্য সম্বন্ধে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়। বহু তথ্যের আলোচনায় রত থাকিবার ফলে সে অনুসন্ধিৎসু এবং নব নব তথ্যের আবিষ্কারক হইবার সুযোগও প্রাপ্ত হয়। অবশ্য এইরূপ বিশেষ বিশেষ আলোচনার পর তথ্যসমূহের অনৈক্য ও পার্থক্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য অন্বেষণ করিতে হইবে। তর্কশাস্ত্রে এই আলোচনা-প্রণালীকে "ইণ্ডাক্‌টিভ্" বা "আরোহ"-পদ্ধতি বলে। ইহাতে জ্ঞান কতকগুলি প্রকৃত বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পুষ্ট হইয়া প্রসার লাভ করিতে পারে।

আরোহ-পদ্ধতি-অবলম্বিত শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষণসমূহ এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ জানা জিনিষের উপর অধিক মনো-

যোগ দিতে হইবে। অজানা বিষয়সমূহ প্রথম হইতেই শিক্ষকের নিকট শুনিয়া আবৃত্তি করিতে হইবে না। এই প্রণালীতে বস্তু-পরিচয় ও পদার্থবিচারের প্রাধান্য থাকিবে। অসংখ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আলোচনার পরে সূত্রসমূহ এবং সাধারণ নিয়ম সকল শিক্ষার্থী আয়ত্ত করিতে থাকিবে। প্রথম অবস্থায় তাহাকে সমীপস্থ, পরিচিত এবং বর্ত্তমান তথ্য ও পদার্থসমূহ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। পরে জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ দূরস্থ, অপরিচিত, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভাব ও পদার্থসমূহের ধারণা করিতে হইবে। স্থূলতর সত্যসমূহের আলোচনা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর সত্যের উদ্দেশ্যে উন্নীত হইতে হইবে।

সাহিত্যসংক্রান্ত বিদ্যাসমূহ এই প্রণালীতে আলোচিত হইলে ইহাদের মূলীভূত উপাদানগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বিশেষভাবে স্বতই আকৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের গোড়ার কথাগুলি আয়ত্ত হইয়া আসিবে। তদ্বিষয়ে মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ অনুশীলন হইতে থাকিবে; এবং শিক্ষার্থীর সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বৃত্তিসমূহের প্রকৃত বিকাশ সাধিত হইবে। এই প্রণালীতে অধ্যাপনাকার্য্য চলিলে গণিতে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহেও যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়। গণিত-শাস্ত্রে রসজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। যে সকল বৃত্তিসঞ্চালনে গণিতশাস্ত্রে অধিকার জন্মে, এবং প্রকৃতি-রাজ্যের নিয়মগুলি অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, এই "আরোহ-পদ্ধতি"র আবিষ্কার-প্রণালীতে সেই সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির অনুশীলনই যথেষ্ট হইয়া থাকে।

মানবীয় ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

মানববিষয়ক বিজ্ঞানসমূহ শিক্ষালাভ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্রণালী ও ভাবসমূহ, কর্ম্ম ও চরিত্রের আদর্শসমূহ, বিচিত্র রীতিনীতিসমূহ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনা করা আবশ্যক। এজন্য মানবের মনোজগৎ, সামাজিক জগৎ, রাষ্ট্রীয় জগৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রের বৈচিত্র্যের সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। তেমনই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ শিক্ষালাভ করিবার জন্যও প্রকৃতি এবং জড়জগতের বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থসমূহের সহিত পরিচিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই উপায়ে বাহ্য জগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। অনলে ভূতলে, পর্ব্বতে জলে, ঋতু-পরিবর্ত্তনে, লতায় পাতায়, জীব-জন্তুতে নানা শক্তির ক্রিয়া অহরহ চলিতেছে। সেই সকলের ফলে জগতে বহু পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। এই সমুদয় শক্তি ব্যবহার করিয়া মানব নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে। শিক্ষার্থীকে সেই সকল বিভিন্ন পদার্থ ও বিভিন্ন শক্তিসমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

এইরূপে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক জগতের নিত্য-নব বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। তাহার দ্বারা বাহ্যবস্তুসমূহের স্বরূপ উপলব্ধি সহজসাধ্য হইবে। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই সকল পদার্থের যথার্থ জ্ঞান লাভ হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রকৃত সংযোগ সাধিত

হইবে। এই উপায়ে পৃথিবীকে বিশেষরূপে চিনিলে ইহার সহিত যথার্থ কুটুম্বিতা স্থাপিত হইবে। তাহার পর বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন অভ্যাস ও ভাবগতিকসমূহ পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে; প্রকৃতি ও জড়জগতের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাব-ভাব, কার্য্যপ্রণালী ও প্রকাশের লক্ষণসমূহ অবগত হওয়া যাইবে; এবং প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া তাহার ভিতরকার কথাগুলি, অন্তর্নিহিত সত্যগুলি সহজে উদ্ধৃত করিতে পারা যাইবে।

দেখা গেল, সাহিত্যসংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও মানসিক জগতের বিচিত্র সমস্যা-সমূহের সম্মুখীন হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্যও বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী অবলোকন করিতে হয়। তেমনই আরোহ-পদ্ধতির আবিষ্কার-প্রণালীতে ব্যবহারিক শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে জগতের যাবতীয় ব্যবহার্য্য পদার্থ প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। বিজ্ঞানাগার ও ল্যাবরেটরীতে কার্য্য করা এবং প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করা প্রাকৃতিকবিজ্ঞান-শিক্ষার প্রধান পন্থা; মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন নিরীক্ষণ করা মনোবিজ্ঞান-শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট উপায়; তেমনি কৃষিক্ষেত্রে, 'ওয়ার্কসপে' ও শিল্প-কারখানায় বস্তু বিচার করা, দ্রব্য-নির্ম্মাণে সহায়তা করা এবং বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রণালী অবলোকন করাই কৃষি ও শিল্পশিক্ষার প্রধান উপায়। এই জন্য পুস্তক ব্যবহার অথবা সূত্র মুখস্থ না করিয়া, কৃষিক্ষেত্র ও

কারখানাকেই পুস্তক, শিক্ষালয় ও শিক্ষকরূপে বিবেচনা করিতে হইবে।

আজকাল শিক্ষার্থীরা কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য সাধারণতঃ সূত্র ও ফর্ম্মুলাগুলি পুস্তক হইতে আবৃত্তি করে এবং দৃষ্টান্ত বা প্রয়োগস্বরূপ কয়েকটি 'একস্‌পেরিমেণ্ট' বা পরীক্ষা করিয়া থাকে। আরোহ-পদ্ধতির শিক্ষা-প্রণালীতে পুস্তক, সূত্র ও নিয়মসমূহের স্থান গৌণ; 'ল্যাবরেটরী,' বিজ্ঞানাগার, কৃষিক্ষেত্র ও কারখানার স্থানই মুখ্য। পুস্তকের সূত্র ল্যাবরেটরীতে আসিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে না। ল্যাবরেটরী প্রভৃতিতে কর্ম্ম করিয়া যে তথ্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত সত্য বিবেচনা করিতে হইবে, এবং ইহার সহিত পুস্তকাদির তথ্য তুলনা করা যাইতে পারে।

'সামান্য ধর্ম্ম' স্বীকার্য্য নহে—প্রতিপাদ্য

এই প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে বহু প্রকারের এবং নানাশ্রেণীর ভাব ও পদার্থ, চিন্তা ও কর্ম্ম, ঘটনা ও পরিবর্ত্তন শিক্ষার্থীর সম্মুখে আনয়ন করিতে হইবে। প্রত্যেকটিকে বহুদিক্ হইতে বিবিধ উপায়ে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করিতে হইবে। ইহার দ্বারা নানারূপ তথ্য সংগৃহীত হইবে। এইরূপে বহু তথ্য সংগৃহীত হইলে পর প্রত্যেক বিষয়ের সামান্য ধর্ম্মসকল, শ্রেণীসমূহ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সাধারণক্রিয়াপ্রণালী, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ এবং পারম্পর্য্যসমূহের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। এই ইঙ্গিত-

গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে ব্যবহার করিতে পারিলে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত সত্যের ধারণা জন্মিবে। তখন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতীয়মান হইবে, এবং ক্রমশঃ তত্ত্বগুলির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আলোচ্য বিষয়ে 'বিজ্ঞান'-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবে।

জাতীয়-শিক্ষা কাহাকে বলে ?

কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালাদেশের স্থানে স্থানে "বঙ্গদেশস্থ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদে"র প্রবর্ত্তিত নূতন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু জাতীয়-শিক্ষার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে দেশের মধ্যে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। এজন্য এবিষয়ে যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেইরূপ ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা কেবলমাত্র দু-একটি ছাত্র বা শিক্ষক অথবা দুই-একটা জাতীয়-শিক্ষালয়ের পরিচয় পাইবার সুযোগ পাইয়াছেন, এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের মতের অথবা কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই জাতীয়-শিক্ষার লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনেক ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে।

জাতীয়-শিক্ষাসম্বন্ধে আংশিক ও দায়িত্বহীন মতামত

অনেকে জাতীয়-শিক্ষার নামমাত্র শুনিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছেন—হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা এবং সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্যই জাতীয়-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ইংরাজী শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই এবং অন্যধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রের কোন স্থান নাই। ইহা এক প্রকার টোলবিশেষ।

অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র শিল্প-কারখানার কার্য্য শিক্ষা দেওয়াই জাতীয়-শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কর্ম্ম এবং বয়নকার্য্য প্রভৃতি বিবিধ শিল্পশিক্ষার দ্বারা অন্ন-সংস্থানের সুবিধার জন্যই জাতীয়-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং যে সকল ছাত্র মেধাবী এবং যাহারা উন্নত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ, তাহারা এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। সাধারণ শিক্ষা দ্বারা উপকার লাভের আশা যাহাদের অতি অল্প এবং যাহাদিগকে অতি বাল্যকালেই কোন একটি জীবিকার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাদের জন্যই জাতীয়-শিক্ষার আয়োজন হইয়াছে।

আবার অনেকে ঠিক বিপরীত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন—কেবলমাত্র ধনবান্ ও অভাবহীন ব্যক্তিদিগের সন্তানেরাই জাতীয়-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। জাতীয়-বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে আর্থিক লাভের তেমন কোন প্রত্যাশা নাই। যাহারা কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চ্চার জন্যই বিদ্যা লাভ করিতে চাহে, তাহারা যে বিদ্যা অর্থকরী নহে, সেই বিদ্যাগ্রহণেও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোক অন্ন-চিন্তায় জর্জ্জরিত। তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি উদাসীন হইয়া সন্তানদিগকে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের জন্য এরূপ নিঃস্বার্থভাবে জাতীয়-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন, জাতীয়-বিদ্যালয়সমূহে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য, বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী ছাত্র প্রবেশ করিয়াছে। যাহারা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মানুসারে শিক্ষা-লাভে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই, অথবা যাহারা সাধারণ বিদ্যালয়-সমূহ হইতে, কোন না কোন কারণে, বহিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা-দিগকে স্থান দেওয়াই জাতীয়-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এখানে সচ্চরিত্র ও বিদ্যানুরাগী ছাত্র প্রবেশ করে না।

আর যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের জন্ম হইয়াছে ভাবিয়া ইহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতিকে কেবলমাত্র হুজুগ মনে করেন, তাঁহারা ভাবেন, কতিপয় হুজুগপ্রিয় ব্যক্তির সাময়িক চেষ্টা ও উত্তেজনার ফলে কতকগুলি অপরিণতবয়স্ক যুবক ও বালকদিগের পরকাল নষ্ট করিবার জন্য দেশের স্থানে স্থানে কতকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিদ্যাদান বা শিক্ষাবিস্তার নহে—বিবিধ হুজুগে যোগদান করাই ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করে মাত্র। এই কেন্দ্রগুলিকে বিদ্যালয় বলা যায় না,—শিক্ষকদিগের স্থিরতা নাই,—ছাত্রদিগের প্রতি কোনরূপ শাসনের ব্যবস্থা নাই—প্রকৃত সুদৃঢ় নিয়ম ও শৃঙ্খলাদ্বারা ছাত্রদিগকে সংযত ও সুচালিত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই।

এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যালয়গুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ। অনেকের ধারণা, জাতীয়-শিক্ষা গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত শিক্ষার বিরোধী হইয়া দেশের উপর কর্ত্তৃপক্ষের কোপ ও বিরাগের

বর্দ্ধন করিতেছে। বিশেষতঃ, বোধ হয়, জাতীয়-বিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহ-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের সহিত বিবিধ রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সংশ্রব আছে! হয়ত, রাজদ্রোহ-প্রচারক পুস্তকাদি জাতীয়-বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়, এবং কোমলমতি শিশুদিগের হৃদয়ে অল্প বয়সেই রাজবিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া দেওয়া হয়; সুতরাং ইহা দ্বারা বালকদিগের ভাবী সর্ব্বনাশের সূচনা এবং দেশে অনর্থক বিবিধ অমঙ্গল-সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করা হইতেছে।

জাতীয়-শিক্ষার প্রকৃত তত্ত্ব

বাস্তবিক পক্ষে, কোন দেশের জাতীয়-শিক্ষা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের কোন এক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন কালে কোন সমাজেই প্রকৃত জাতীয়-শিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষায় পর্য্যবসিত হইতে পারে না। যেখানে দেখা যাইবে যে, দেশের সন্তানসন্ততিদিগের শিক্ষা একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠে পরিণত হইয়াছে,—সেখানে বুঝিতে হইবে জাতীয়-শিক্ষায় আবর্জ্জনা পুড়িয়াছে।

জাতীয়-শিক্ষায় শিল্পশিক্ষা বা জীবিকা-অর্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা বুঝায় না। জাতীয়-শিক্ষা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা নহে; জাতীয়-শিক্ষার অর্থ সমরশিক্ষা বা শারীরিক শিক্ষা নহে,—স্ত্রীশিক্ষা বা লোকশিক্ষা নহে; জাতীয়-শিক্ষার অর্থ স্বদেশ-হিতৈষণা-শিক্ষাও নহে।

সমগ্র সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষের বিকাশ সাধন করিয়া যে শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় প্রকৃতি ও বিশেষত্বের পরিণতি ও পূর্ণতা বিধানের সহায় হয়, সেই জাতীয় চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধনোপযোগী শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয়-শিক্ষা। যে নামেই অভিহিত হউক, আর যাহার কর্তৃত্ব ও নায়কতায়ই পরিচালিত হউক না কেন, এই শিক্ষাই জাতীয়-শিক্ষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশ-প্রণালী

মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতির সাহায্যে এবং পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিসমূহের প্রভাবে সেই সকলের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের অন্যান্য শক্তির সংঘর্ষে তাহার কৈশোরযৌবনাদি অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মেই গঠিত হইতে থাকে। সমাজে বিশেষ কোন সাহায্য না থাকিলেও, মানুষের মন ও শরীর আপনা আপনিই বহির্জ্জগৎ হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে। এইরূপে বিশ্ব-শক্তির সাহায্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশই জীবিত অবস্থার লক্ষণ এবং জীবনীশক্তির কার্য্য। এই জীবনীশক্তির পুষ্টি সাধন করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-বিকাশের সহায়তা করা, যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্য।

অতএব যদি আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিসাধনের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে

সেই ব্যবস্থাকে এই স্বাভাবিক জীবনগঠনপ্রণালীরই সহায় হইতে হইবে। মানুষের জন্য যদি শিক্ষাগার প্রস্তুত করিতেই হয়, তবে তাহার সমাজের, ধর্ম্মের ও দেশের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা সম্যক্-রূপে বুঝিয়া লইতে হইবে, এবং তদনুকূল অতি সুসাধ্য ও সহজ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিলে, নৈসর্গিকমনুষ্যত্ব-বিকাশের ও স্বাভাবিকচরিত্রগঠনের বিঘ্ন উৎপন্ন হইবে; এবং তাহার ফলে বিকৃতস্বভাব, অপ্রকৃতিস্থ, ব্যক্তিত্বহীন লোকসমাজের সৃষ্টি হইবে।

শিক্ষা-পদ্ধতির বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী

এই জন্যই দেশভেদে ও কালভেদে শিক্ষালাভের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এক সমাজে এক সময়ে যাহা স্বাভাবিক ও সহজ, সেই সমাজেরই অবস্থান্তরে তাহা অস্বাভাবিক এবং অহিতকর হইতে পারে। এক অবস্থার প্রতীকার অন্য অবস্থার ব্যাধির কারণ হওয়া অসম্ভব নহে। সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের সকল প্রকার শক্তিরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে নূতন প্রণালীতে যথোচিত ব্যবহার করিবার উপযোগী না হইলে শিক্ষাপদ্ধতি 'সেকেলে' থাকিয়া যায়। এই 'সেকেলে' নিয়মের অধীন শিক্ষার্থিগণ বেশ সহজ উপায়ে আবেষ্টনের নৈতিক ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ হইতে জীবন-বিকাশোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না। এই জন্যই উহারা বিকৃত হইয়া অর্দ্ধবিকশিত বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

চতুষ্পার্শ্বস্থ শক্তিপুঞ্জ হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মানুষ বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার জন্য স্বাধীন ভাবে সেই বিশ্বশক্তিকে, সেই সকল উপাদানকে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কারণ শক্তির বিকাশ স্বকীয় চেষ্টা ও দায়িত্বের উপর নির্ভর করে। এমন কি, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের চরিত্রগঠনের জন্য ব্যবস্থা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকেও এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অভিভাবক উহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলেই শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারিবে।

শিক্ষায় স্বাবলম্বন

সুতরাং যে কোন দেশে এবং যে কোন যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সেই দেশের ও সেই যুগের শিক্ষাগুরুদিগকে তদ্দেশোপযোগী "স্বাভাবিক" এবং তৎকালোচিত "আধুনিক" শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। 'প্রথমতঃ, সমাজের সনাতনী প্রকৃতি কি, কোথায় ইহার প্রাচীন বিশেষত্ব, কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তৎকালের যুগধর্ম্ম কি, অর্থাৎ সেই যুগে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ভাব ও কর্ম্মসমূহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ নূতন অবস্থা-সংঘটন হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে,—বিশ্বশক্তি-পুঞ্জের এই সকল তথ্য আলোচনা না করিলেও সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ সমাজোপযোগী এবং তৎকালোচিত

"আধুনিক" শিক্ষাপদ্ধতিই স্বাভাবিক, এবং উহাকে 'জাতীয়-শিক্ষা' বলা হয়। ইহার দ্বারাই সেই জাতির তৎকালোপযোগী জীবন-বিকাশের সুবিধা ঘটে। তাহার প্রভাবে সমাজের ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় স্বাভাবিক কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ জাতীয়-জীবনের উন্নতিতে সহায়তা করে। ফলতঃ মানব-সভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

একদিকে পুরাতন প্রথার প্রচলন অথবা উহাকে স্থায়ী করিতে গেলে, জোর করিয়া এক অনৈসর্গিক ক্রিয়ার অভিনয় করা হয়।

স্বাভাবিক শিক্ষার লক্ষণ

পক্ষান্তরে, পুরাতন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না হইলে, বালুকার উপর অট্টালিকা-নির্ম্মাণের ন্যায়, সকল প্রয়াস বিফল হইয়া যায়। এজন্য প্রথমতঃ, দেশের সম্প্রদায়প্রবাহ, ধর্ম্মপ্রবাহ, কুলপ্রবাহ ও জ্ঞানপ্রবাহ—প্রত্যেক বিরাট প্রবাহের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনপ্রবাহের সহজ ও স্বাভাবিক সংযোগ বিধান করা আবশ্যক। যাহাতে সমগ্র জাতীয়-জীবনের প্রভাব ব্যক্তিগত জীবন-প্রবাহের অঙ্গীভূত হইতে পারে, শিক্ষাপ্রচারকদিগকে প্রথমতঃ এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তেমনই আবার অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজ এতদিনের কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সহিত শিক্ষার্থীর জীবনধারা ও ব্যক্তিত্ব-প্রবাহের সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টাও তাঁহাদিগকে করিতে হইবে।

শিক্ষায় "স্বাভাবিকতা"

জাতীয়-শিক্ষা সমাজোপযোগী

কোন দেশের শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয়-চরিত্রের অনুরূপ ও উপযোগী না হইলে, জাতীয়-চরিত্রের পরিপূর্ণতাবিধানে সহায় হইতে পারে না। জাতীয়-প্রকৃতি ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের অভ্যন্তরে নিজের পারম্পর্য্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যুগে যুগে স্বকীয় বিশেষত্বের অভিব্যক্তি করিয়া থাকে। সেই ইতিহাসগত বিশেষত্ব ও চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান ও সম্যক্ অনুসরণ কারণেই, দেশের শিক্ষাতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণকে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালকরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং জাতীয়-শিক্ষার অর্থ জাতীয়-চরিত্রের অনুবর্ত্তনধারা অর্থাৎ স্বাভাবিক শিক্ষা। এজন্যই দেশের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলা জাতীয়-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা দেশীয় অতীত সম্পদ-ভাণ্ডারের প্রবেশ-দ্বার। এজন্য প্রত্যেক দেশের স্বাভাবিক শিক্ষাপদ্ধতিতে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ই মাতৃভাষায় শিখান হয়, পরকীয় ভাষা এবং বিদেশীয় সাহিত্য গৌণমর্য্যাদা এবং দ্বিতীয় স্থান মাত্র প্রাপ্ত হয়। ইউরোপের ছাত্রেরা মধ্যযুগে বিদেশীয় সাহিত্য, বিদেশীয় দর্শন প্রভৃতিই প্রধানতঃ শিক্ষালাভ করিত। আবার এজন্য তাহারা বিদেশীয় ভাষা ব্যবহার করিত। সকলেই আজকাল স্বীকার করেন যে, সেই কারণে সেই সময়ে ইউরোপখণ্ডের কোন দেশেই, কি

সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয়, কি শিক্ষা-সম্বন্ধীয়, কি বৈষয়িক, কি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই জাতীয় চরিত্রস্বাতন্ত্র্য ও প্রকৃতি-পার্থক্য জন্মে নাই।

দেশের ক্রমবিকশিত সভ্যতা এবং শিক্ষার্থীর ভাষা ও জাতীয়-সাহিত্যই 'জাতীয়-শিক্ষা'র মৌলিক উপাদান। তাহার কারণ বুঝা সহজ। মানবের জ্ঞান, মানবের ধারণা সকলই আত্মোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিজের সহিত তুলনা সাধন ও পার্থক্য অনুভব করিয়াই, এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়াই মানব বিশ্বের উপলব্ধি করিতে পারে। মনোবিজ্ঞানের এই সত্যটির উপর শিক্ষাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে স্বাভাবিক জাতীয়-শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বা বিজ্ঞানানুমোদিত শিক্ষা বলা যায়।

শিক্ষায় "আধুনিকতা"

ব্যক্তির গঠনোপযোগী, এবং চরিত্রের বিকাশ-সাধনোপযোগী শিক্ষা একদিকে সমাজানুরূপ, অপরদিকে কালোপযোগী। পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিপুঞ্জের সহিত মানবের পরস্পর আদান-প্রদানেই মানবের স্বভাব বিকাশপ্রাপ্ত হয়—বিশ্বশক্তির সাহায্যে তাহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গড়িয়া উঠে। এজন্য প্রত্যেক জাতি স্বকীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে পারিপার্শ্বিক ভাবসমূহকে নিজের স্বতন্ত্র পুষ্টিসাধনের অনুকূলরূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। এই কারণে জাতীয়-শিক্ষাকে পারিপার্শ্বিকের উপযোগী শিক্ষা বলা যাইতে পারে।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের কালে কালে পরিবর্ত্তন হয়। অথচ শিক্ষাপদ্ধতি যদি যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত না হয় বরং চিরকালই একরূপ থাকে, তাহা হইলে শিক্ষার্থীর জীবন পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক হইতে স্বকীয় পুষ্টিসাধনোপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয়। বিশ্বশক্তির প্রভাবে ব্যক্তিত্ব-গঠনের কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। ফলতঃ শিক্ষার্থীর জীবন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এজন্য জাতীয়-শিক্ষা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কালানুবর্ত্তী। বিশ্বের সভ্যতাশক্তির নূতন নূতন সমাবেশের ফলে প্রত্যেক দেশে ও সমাজে সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সকল বিভাগেরই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতি যদি পুরাতন প্রথাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে সেই দেশে ও সেই সমাজে জাতীয়-চরিত্রের বিকাশসাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইবেই। সেই সমাজ পারিপার্শ্বিক ভাব ও পদার্থসমূহকে নিজের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিতে অসমর্থ হইবে। তখন জাতি জীবনীশক্তি হারাইয়া বিশ্বসভ্যতার এক অতি নিম্নস্তর-প্রোথিত অস্থিকঙ্কালের ন্যায় নিস্পন্দ ও অসাড় ভাবে পড়িয়া রহিবে। ঈদৃশ শিক্ষা-পদ্ধতিকে আর জাতীয়-শিক্ষা বলা যায় না।

শিক্ষা-পদ্ধতি কালোপ-যোগী

অতএব পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তিতা ও কালোপযোগিতা অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীলতা জাতীয়-শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষণ। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। মানবের জন্য ব্যক্তিত্ব-বিকাশের যথোচিত সুযোগ সৃষ্টি করিয়া তাহার

শিক্ষার ব্যবস্থায় যুগধর্ম্মের প্রভাব

ভিতরকার শক্তিগুলি প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়াই শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য। বিশ্বশক্তিও আবেষ্টন হইতে সেই সুযোগগুলি প্রাপ্ত হইলে মানবের বৃত্তিসমূহ স্বতই বিকশিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু বিশ্বশক্তির অন্তর্গত এই সুযোগসমূহের সহিত মানবের কোনরূপ বিরোধ বা বৈষম্য ঘটিলে, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বিশ্বে অহরহ বিবিধ সুযোগের সৃষ্টি হইতেছে। যে যে সমাজের শিক্ষাতত্ত্ববিদেরা অথবা শিক্ষা-প্রচারকেরা এত উদাসীন যে, সেই সকল সুযোগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন না, সেই সকল সমাজের শিক্ষাপদ্ধতি যুগধর্ম্মের অতি পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে। নূতন যুগের নূতন সভ্যতার মধ্যে সেই পথভ্রান্ত নির্জ্জীব পুরাতন-শিক্ষাপদ্ধতি-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বা জন-সমাজ কাহারও বা অবজ্ঞা, কাহারও দয়ার পাত্র, অথবা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সমালোচনার উপযুক্ত পদার্থ মাত্র হইয়া থাকিবে। প্রাণ-বিজ্ঞানের এই সাধারণ তত্ত্বের উপর জাতীয়-শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষা-বিজ্ঞান

কোন সমাজে জাতীয়-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, শিক্ষানুশাসন সম্বন্ধে প্রধানতঃ এই দুইটি প্রশ্ন করিতে হইবে।

[১] মনোবিজ্ঞানের প্রশ্ন—শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় স্বভাবের উপযোগী কি না—এজন্য

(ক) দেশের সনাতন সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের সহিত শিক্ষার্থীর পরিচিত হইবার সুব্যবস্থা আছে কি না ; এবং

(খ) উচ্চতম শিক্ষার আয়োজনেও শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা ব্যবহারের বিধান আছে কি না ?

[২] প্রাণ-বিজ্ঞানের প্রশ্ন—শিক্ষা-পদ্ধতি দেশের বর্ত্তমান অভাব-মোচনের উপযোগী কি না। তাহার বিধানে তৎকালীন বিশ্বের মধ্যে জাতিকে সচেতনভাবে পরিপুষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে কি না—অর্থাৎ শিক্ষা যুগ ধর্ম্মের অনুরূপ কি না ?

লোক-শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, ধর্ম্ম-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, দেশ-হিতৈষণা-শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ই জাতীয় শিক্ষার গৌণ লক্ষণ। এই সমুদয় প্রধান লক্ষ্য হইতে পারে না, ইহারা উপরি উক্ত মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহেরই অন্তর্গত। শিল্প, ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রনীতির প্রভাবে শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত না হইয়া প্রাণ-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেই জাতীয়-শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ভারতের নব্য শিক্ষানুশাসন

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ শিক্ষা প্রচারের জন্য শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এই নূতন উদ্দেশ্য-সাধনোপযোগী শিক্ষক তৈয়ারী করিয়া লইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা না

করিয়া কেবল গৃহপ্রতিষ্ঠা ও ভূমিক্রয়ে অর্থব্যয় করিলে, বিদ্যালয়ের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইবে না।

এতদ্ব্যতীত, কেবলমাত্র বেঞ্চ-টুলের স্বাতন্ত্র্যে, বিদ্যালয়-গৃহের স্বাতন্ত্র্যে ও পরিচালনা-সমিতির স্বাতন্ত্র্যে শিক্ষাপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টীকৃত হয় না। প্রথম হইতেই ছাত্র ও শিক্ষকদিগের চিত্তে নবযুগের এই নূতন শিক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে; এবং শিক্ষাবিস্তার, বিজ্ঞান-প্রচার, সাহিত্য-সেবা, পরোপকার প্রভৃতি কার্য্যের প্রতি হৃদয়ের আসক্তি জন্মাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃত শিক্ষা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের চিন্তা ও কর্ম্মরাশি স্থির ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবে।

ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী

শিক্ষণীয় বিষয়ের বহুলতা

নানা কারণে আধুনিক কালে শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে সভ্যজগতের এমন এক অবস্থা ছিল, যখন কেবল ধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাই শিক্ষার্থীর একমাত্র সাধনা থাকিত। ক্রমশঃ মানবসমাজ যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র ধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিলেই জীবনের সর্ব্ববিধ অভাব মোচিত হয় না। এখন বাহ্য জগতের নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বহু নূতন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; সেই বিজ্ঞানসমূহের সত্যগুলি আয়ত্ত করিতে না পারিলে মানবের যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। কাজেই পদার্থ-বিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত, সংসারযাত্রা বর্ত্তমান জগতের প্রধান সমস্যা। এই জীবনসংগ্রামোপযোগী বিবিধ অস্ত্রের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। এজন্য আধুনিক শিল্পপ্রথা এবং ব্যবসায়পদ্ধতি শিক্ষা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলতঃ, বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার্থীর পক্ষে পদার্থ-বিজ্ঞান ও ব্যবসায় সাহিত্যের সঙ্গে সমানভাবে প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

অভিনব আলোচনা-প্রণালীর আবশ্যকতা

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু এই সমুদয় শিক্ষা করিবার উপযোগী সময় শিক্ষার্থীর পক্ষে সমানই রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে সময়ের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া শিক্ষার্থী সংসারের জীবনসংগ্রামোপযোগী বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত, এখনও তাহাকে সেই পরিমাণ সময়ের ভিতর আধুনিক কালের অনুরূপ উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবন আধুনিক কালে চিন্তাজগতের প্রধান সমস্যা। যে প্রণালীতে অল্প সময়ে বহু বিষয় আয়ত্ত করিতে পারা যায়, সেরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিলে আজকাল জীবনের উন্নতি আশা করা বৃথা। আর বাস্তবিক পক্ষে, সময় ও শ্রমের লাঘব করিয়া মানবের শক্তিগুলিকে বহুবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার সুবিধা সৃষ্টির জন্যই নূতন নূতন চিন্তাপ্রণালীর উদ্ভব হইয়া থাকে। এইজন্য প্রাচীন ও মধ্য যুগের নূতন অধ্যয়নপ্রণালী এবং চিন্তাপদ্ধতি পরিহার করিয়া এক্ষণে নূতন শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কারের প্রয়োজন উপস্থিত এবং প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে।

পঠন-পাঠনের পুরাতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও এক বিভাগ আয়ত্ত করিতেই ছাত্রের চিরজীবন কাটিয়া যাইত। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মেও সাত বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষার্থী রঘুবংশের সাতসর্গ

মাত্র কোনরূপে মুখস্থ করিবার শক্তি অর্জ্জন করে। বলা বাহুল্য সেই প্রণালীগুলি এখন আর কোন মতেই ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে এক সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহার দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়-গুলিকে আয়ত্ত করিতে যাইয়া শিক্ষার্থী সেই সমুদয়ের মধ্যে পরস্পর-সহায়কত্ব-সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে। তাহার ফলে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিবার সঙ্গেই বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষারও কথঞ্চিৎ সাহায্য হইবে, এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা এবং সাহিত্যে অধিকারও জন্মিবে। শিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের পরস্পর-সাপেক্ষতা ভুলিয়া গেলে, অথবা ছাত্রের শিক্ষায় তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহার না করিলে শিক্ষাপ্রচারকগণ নব-যুগোপযোগী বৈচিত্র্যময় ও বহুমুখীন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

ভাষা-শিক্ষার নূতন প্রণালী

ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধ, ভাষার উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ক্রমিক বিকাশের নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভাষাশিক্ষার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে বক্তব্য ও ভাবসমূহের প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। বাক্যরচনা ও পদযোজনাই ভাব ও ভাষার একমাত্র উপাদান। বাক্যরচনার নৈপুণ্য জন্মিলেই ভাষা আয়ত্ত হইতে পারে, নতুবা নহে।

এজন্য অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্দ মুখস্থ বা ব্যাকরণের নিয়ম আবৃত্তি করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। অধিকসংখ্যক শব্দের বানান, বা উচ্চারণ করিতে কঠিন যুক্তাক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের অর্থ জানিলেই ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিল মনে করিতে হইবে না। কারণ কেবলমাত্র কঠিন কঠিন শব্দের প্রয়োগেই ভাষা কঠিন হয় না। ভাব কঠিন হইলেই প্রকৃত পক্ষে ভাষা কঠিন হয়। সহজ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কঠিন শব্দ ব্যবহার করিলেও অনেক সময়ে ভাষার কাঠিন্য প্রতীয়মান হয় না; অথচ কঠিন ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া অযুক্তাক্ষরবিশিষ্ট অতি সরল শব্দ ব্যবহার করিলেও অনেক সময় ভাষা কঠিনই থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রথম হইতেই কঠিন বা বহুসংখ্যক শব্দ-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। তাহার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর স্বীয় ভাবপ্রকাশোপযোগী বাক্যরচনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করা উচিত। ভাবসমূহ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কঠিন ও জটিল হইতে থাকিবে। তদনুসারে শিক্ষার্থীকে কঠিন ও জটিল বাক্যের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইবে। ক্রমশঃ সে ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিচ্ছিন্ন বাক্য-রচনা পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্খলীকৃত ও সুসম্বদ্ধ এবং ঐক্যবিশিষ্ট বাক্য-পরম্পরা অবলম্বন করিবে।

মাতৃভাষা-শিক্ষা

মাতৃভাষা শিক্ষা করিবার নিয়মগুলি বুঝিতে পারিলে ভাষা-শিক্ষার সাধারণ প্রণালী অনেকটা বুঝা যাইবে। শিশু প্রথম

হইতেই তাহার মনোভাব প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হয়। নানাবিধ বাক্য-রচনায় এই অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অভ্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) বিশ্বের যাবতায় পদার্থ-বিষয়ক বাক্যরচনা

প্রথমতঃ, সমগ্র জ্ঞেয় বিশ্বই মানবের মনোবৃত্তিনিচয়কে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং কি প্রাকৃতিক, কি মানবীয় উভয় জগৎই তাহার বাক্যপ্রয়োগের ক্ষেত্র। এজন্য শিক্ষার্থীর বাক্যরচনা কোন এক পদার্থ বা এক বস্তুতে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। সর্ব্ব পদার্থ এবং জগতের সর্ব্ববিধ ঘটনাই ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে একদিকে তাহার ভাষার বৈচিত্র্য জন্মে, অপরদিকে বিশ্বের বিবিধ সজীব ও নির্জ্জীব পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে সহায়তা হয়। তাহার ফলে শিক্ষার্থী কেবলমাত্র ভাষাই শিক্ষা করে না; ভাষার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তির সৃষ্টি হয় এবং জ্ঞানবিকাশের উপযোগী বিবিধবিদ্যা-শিক্ষাও হইতে থাকে। সুতরাং ভাষা-শিক্ষার সময়ে যদি শিক্ষার্থী অন্যান্য বিভাগের অধীত বিদ্যালব্ধ জ্ঞান প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সকল বিদ্যার মধ্যে পরস্পর সহায়তাবিধায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাতে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়, ভাষা-শিক্ষা জীবন্ত হয় এবং অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তিও দৃঢ় হইতে পারে।

(২) ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বিভিন্ন পদার্থবিষয়ক বাক্য এবং বিবিধ রচনা-প্রণালী অবলম্বন

দ্বিতীয়তঃ, বয়সের তারতম্যানুসারে বাক্যরচনাপ্রয়োগের ক্ষেত্রের এবং বাক্যরচনা-প্রণালীর তারতম্য হওয়া উচিত। সমগ্র জগৎই শিক্ষার্থীর জ্ঞেয় বটে, কিন্তু সমগ্রটা একই বয়সে জ্ঞেয় নহে। এইজন্য প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার্থীর সুপরিচিত পদার্থ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহেই বাক্যরচনা-প্রণালী আবদ্ধ রাখিতে হইবে। যে বিষয়ে কখনও কোন আলোচনা হয় নাই, তাহার সহিত পূর্ব্বপরিচিত বা আলোচিত বিষয়ের যদি কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সেই নূতন বিষয় সম্বন্ধে বাক্যরচনা করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থসমূহের মধ্যে বিভাগ ও বিশ্লেষণ সাধন করিয়া সুবোধ্য অংশগুলিকেই বাক্য-রচনার বিষয় করিতে হইবে। এই উপায়ে ক্রমে ক্রমে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ শিক্ষার্থীর ভাষায় আয়ত্ত করিতে হইবে।

(৩) অভ্যস্ত বাক্যসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নূতন বাক্যরচনা

তৃতীয়তঃ, কোন পদার্থের বর্ণনা করিতে হইলে শিক্ষার্থী যে বাক্য কয়েকবার রচনা করিয়াছে, সেই বাক্যসমূহের সাহায্যেই তাহার নূতন বাক্যরচনা শিক্ষা করিতে হইবে। পূর্ব্বের অভ্যাস অবলম্বন করিয়াই নূতন প্রয়াস করিতে হইবে। সুতরাং বাক্য

হইতে বাক্যান্তরে গমন করিবার সময়ে ভাব হইতে ভাবান্তরে গমনের স্বাভাবিকতা এবং সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৪) প্রথমতঃ সরল ও সহজ বাক্যরচনা

চতুর্থতঃ, কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে একেবারেই বহু বাক্য রচনা করিতে হইবে না। বাক্যসমূহ প্রথম অবস্থায় সরল ও অ-জটিল থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথম অবস্থায় বাক্যগুলি যেন বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সূক্ষ্মভাবব্যঞ্জক না হয়। প্রাথমিক বাক্যগুলি স্থূলগুণবাচক এবং সহজভাবজ্ঞাপক হইলেই পরবর্ত্তী স্তরের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত হইতে পারিবে।

(৫) প্রথমতঃ অসম্বদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ বাক্যরচনা

পঞ্চমতঃ, যথেষ্ট উন্নতির পূর্ব্বে বিচিত্র ভাবপ্রকাশোপযোগী বিচিত্র বাক্য-রচনা শিক্ষা করিতে হইবে না। প্রথমেই জ্ঞেয় জগৎ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বাক্য রচনার অভ্যাস করা অনাবশ্যক। বাক্যসমাবেশের রীতি, লিপিচাতুর্য্য ও রচনাকৌশল শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে অসংলগ্ন পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনায় পটুত্ব অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। অবশেষে প্রবন্ধাদি উচ্চ সাহিত্য রচনা অভ্যাস করিতে হইবে।

অভিধান ও ব্যাকরণ

এইরূপে বাক্যরচনাদ্বারা ভাষার প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারিলে, শিক্ষার্থীর শব্দ-সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তখন উচ্চ-সাহিত্য পাঠ করিবার জন্য অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত সাহিত্য হইতেই শব্দসমূহ বাছিয়া লইয়া সেই সমুদয়ের স্বাধীন ব্যবহার অভ্যাস করা আবশ্যক।

এই উপায়ে কথা বলিতে এবং প্রবন্ধ লিখিতে শিখিলে ভাষা আপনা আপনি সহজেই আয়ত্ত হইয়া আসিবে। ভাষার ব্যবহারে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা জন্মিবার পর ভাষার অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক।

ভাষা ব্যবহার করিবার সময়ে, ভাষা অভ্যাস করিতে যাইয়াই এবং ভাষার প্রয়োগ দেখিতে দেখিতে ভাষা-নিবদ্ধ বাক্য-রচনা-প্রণালী সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা পূর্ব্বেই জন্মিয়াছে। এক্ষণে, যুক্তিদ্বারা সেই প্রণালীর বিশ্লেষণ ও আলোচনা এবং তাহার নিয়মসমূহ ও বৈয়াকরণিক রীতিগুলি 'আবিষ্কার' করা কর্ত্তব্য।

ব্যাকরণ ভাষার ন্যায়শাস্ত্র মাত্র। ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ মুখস্থ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভাষাশিক্ষার পূর্ব্বে অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণের পঠন-পাঠন অনাবশ্যক। ভাষাশিক্ষায় কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে ব্যাকরণের আলোচনা আরব্ধ হইতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ এক অঙ্গস্বরূপই ব্যাকরণের স্বতন্ত্র আলোচনা সঙ্গত। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই এই ধারণা শিক্ষার্থীর বদ্ধমূল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী

অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিতে হইলেও মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রণালীই অবলম্বন করা আবশ্যক। সেই ভাষাকে মাতৃভাষার ন্যায় মনে করিতে হইবে, এবং সকল বিষয়ে মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রণালীই গ্রহণ করিতে হইবে।

লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে লোকেরা নিজ মাতৃভাষায় কথা বলিয়া মনোভাব প্রকাশ করে। সেইরূপ অন্যান্য ভাষা শিখিবার সময়েও সেই সকল ভাষাতে নিজ মনোগতভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাই করিতে হইবে।

কোন নূতন ভাষা শিখিতে হইলে, তাহার কতকগুলি শব্দ-শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথম হইতেই সেই ভাষাতে কথা বলিতে শিক্ষা করাই আবশ্যক।

নূতন ভাষার বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই সেই ভাষায় মনোভাব প্রকাশোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলি শুনিয়া শুনিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। এই উপায়ে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের ফলে কতকগুলি শব্দ অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। তখন সেই সকল শব্দ লইয়া বাক্যরচনা করা আবশ্যক। এই উপায়ে সেই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার যে বিশেষ প্রণালী আছে, ঠিক সেই প্রণালীর সহিত সম্যক্ পরিচয় হইতে থাকিবে। সেই ভাষা-ভাষী ব্যক্তিরা বাক্যরচনা ও পদযোজনা যে প্রণালীতে করিয়া থাকে, তাহার সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজের প্রয়োজনমত বাক্যরচনা অভ্যাস করিবে।

সংসারের কেবলমাত্র কোন এক বিভাগের সম্বন্ধে বাক্যরচনা অভ্যাস করিলে চলিবে না। জগতের প্রত্যেক বিষয়েই সেই প্রণালীর ব্যবহার করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, শিক্ষার্থী সেই নূতন ভাষায় প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অসম্বদ্ধ এবং স্থূল ভাব প্রকাশ করিতে অভ্যাস করিবে; পরে তাহাকে জটিল, সুসম্বদ্ধ ও সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করিতে শিখিতে হইবে। এই উপায়ে সেই ভাষায় ক্রমশঃ বাক্য-পরম্পরা রচনা করিবার সময় আসিবে। তখন তাহাকে প্রবন্ধ-রচনায় ও সাহিত্যালোচনায় অধিকার-লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

এইরূপে নূতন ভাষায় প্রবেশলাভের পর সেই ভাষার নিয়ম ও ইতিহাস এবং সাহিত্যের ইতিবৃত্তের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

ভাষাশিক্ষার সাধারণ নিয়ম

কি মাতৃভাষা, কি অন্যান্য ভাষা, সকল ভাষাই শিক্ষা করিবার নিয়ম মোটামুটি একরূপ। শিক্ষাপ্রচারকের সর্ব্বদা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ ভাষা ও সাহিত্য দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। ভাষা শিক্ষা করা এবং সাহিত্য শিক্ষা করা একই বিষয় নহে। মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই ভাষার কার্য্য সিদ্ধ হইল। এই মনোভাব-প্রকাশ যে উপায়ে অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে, সেই উপায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা। সুতরাং ভাষা-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষার্থীকে সেই উপায়গুলির সহিতই পরিচিত

(১) ভাষা সাহিত্য নহে

হইতে হইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে ভাষার ব্যবহার করা হইল বুঝিতে হইবে।

ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইলেই ভাবের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। নিকৃষ্ট ভাবসমূহও উৎকৃষ্ট ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে।

এই ভাবসমূহই সাহিত্যের উপাদান। উচ্চ অঙ্গের উৎকৃষ্ট ভাবসমূহ শিক্ষা করিলেই উচ্চসাহিত্য শিক্ষা করা হয়। আবার, উৎকৃষ্ট ভাব হইলেই ভাষা উৎকৃষ্ট হয় না। অতি সুন্দর ভাবসমূহও নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে।

সুতরাং ভাবের ক্রমবিকাশের ফলে সাহিত্যের পুষ্টি, এবং ভাবপ্রকাশোপযোগী উপায়ের ক্রমবিকাশের ফলে ভাষার উৎকর্ষ। ভাষা ও সাহিত্যের গতি দুই বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বাক্যরচনা করিতে হয়। এজন্য ভাষা ব্যবহার করিবার সময় চিন্তাশক্তির বিকাশোপযোগী মনোভাব প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যেও প্রবেশলাভ হইয়া থাকে।

(২)
ভাষা-শিক্ষা ও সাহিত্য-শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে

এইরূপে কিয়ৎকাল যুগপৎ ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা চলিতে থাকিবে। পরে যে অবস্থায় ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে বলিয়া আশা করা যায়, সেই অবস্থায় মুখ্যভাবে সাহিত্যশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তখন ভাষার নিয়ম ও ইতিবৃত্ত অর্থাৎ

ব্যাকরণাদি শিক্ষা করিবার ভিন্ন বন্দোবস্ত করা উচিত। অধিকন্তু, সঙ্গে সঙ্গে অভিধান ব্যবহার করিয়া শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিতেও চেষ্টা করা সঙ্গত।

তৃতীয়তঃ, ভাষা প্রধানতঃ বাচনিক এবং মৌখিক। ধ্বনিই ইহার প্রাণ,—কর্ণই ইহার বিজ্ঞাপক। সুতরাং ভাষা-শিক্ষায় ধ্বনি-প্রকাশক মৌখিক কথাই প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। লিখিত হইলে ভাষা সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায়। ইহাতে ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়।

(৩)
লিখিতে পড়িতে ও বাণান করিতে শিখিবার পূর্ব্বে ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে

সুতরাং শিক্ষার্থী যখন ভাষা লিখিতে আরম্ভ করিল, তখন বুঝিতে হইবে, সে সম্পূর্ণ নূতন এক বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লিখনদ্বারা আনুষঙ্গিকরূপে ভাষা-শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হয়। ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই লিখিতে শিক্ষা করিবার অন্যবিধ প্রয়োজনও আছে। কিন্তু কেবলমাত্র ভাষা শিখিবার জন্য লিখন-প্রণালীর আদৌ কোন প্রয়োজন নাই।

সুতরাং লিখিতে শিখিবার পূর্ব্বেই মুখে মুখে ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতেই ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য রক্ষিত হইবে এবং এই শিক্ষা-প্রণালীর ফলে ছাত্র সজীবভাবে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

ভাষাসম্বন্ধে শিক্ষা-সূত্র

ভাব ও ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিলে ভাষাশিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে এই কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ, বাক্য ভাষার প্রধান লক্ষণ; সুতরাং লিখিতে, পড়িতে ও বাণান করিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই বাক্য রচনা করিতে শিখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, যে ভাষা ব্যবহার করা হইতেছে, বাক্য-রচনা করিতে হইলে তাহারই বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া জ্ঞেয় পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য জগতের পরিচিত পদার্থ সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অপরিচিত পদার্থ সম্বন্ধে মনোভাব প্রকাশের নিমিত্ত বাক্য রচনা করিতে হইবে; এই উপায়ে অন্যান্য বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদ্যালব্ধ জ্ঞানবিষয়ে বাক্যের প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে। ইহার ফলে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ, প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বাক্য রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ বাক্যপরম্পরা দ্বারা সামঞ্জস্যবিশিষ্ট ভাব প্রকাশ করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, বিবিধ ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে বিচিত্র বাক্য রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া ভাষার বিশেষ পদ্ধতির সহিত সম্যক্ পরিচিত হইলে, সাহিত্য-শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ, যে অবস্থায় সাহিত্য-শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে, সেই অবস্থায় ভাষার অভিধান ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ, তৎপরে ভাষার নিয়ম অর্থাৎ ব্যাকরণ এবং ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস শিক্ষা করিয়া চিন্তার ধারা ও মনোভাব প্রকাশের উপায়ের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

ভাষাশিক্ষার পর্য্যায়

এই শিক্ষা-সূত্র অনুসারে ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে বিভক্ত হইবে।

প্রথম পর্য্যায়—বাক্য-রচনা। প্রথমতঃ, বয়সের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পদার্থবিষয়ক; দ্বিতীয়তঃ, অসম্বদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ বাক্য-পরম্পরা ব্যবহার। তৃতীয়তঃ, স্বতন্ত্র সাহিত্যশিক্ষা।

দ্বিতীয় পর্য্যায়—অভিধান-শিক্ষা। প্রথমতঃ ভাষাতে যে সমুদয় Idiom ও Phrase প্রভৃতি বিচিত্র শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সহিত পরিচিত হইতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যে যে সমুদয় ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রীয় উল্লেখ Allusions, References প্রভৃতি সুপ্রচলিত, সেগুলির পূর্ণ বিবরণের সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

তৃতীয় পর্য্যায়—ভাষার নিয়ম ও ইতিহাস শিক্ষা। বাক্য-রচনা শিখিয়া ভাষা আয়ত্ত করিবার পর ভাষার মৌলিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিতে হইবে, এবং তাহার সাধারণ নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে হইবে। চিন্তাশক্তির বিশেষ বিকাশ সাধিত না হইলে, এই বিশ্লেষণকার্য্য সমাধা হইতে পারে না, কারণ

প্রকৃত পক্ষে ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কার্য্য। যে বয়সে এবং যে পরিমাণ সাধারণ জ্ঞানবিকাশের পর ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহার পূর্ব্বে ভাষা-ঘটিত ন্যায়শাস্ত্রেও অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ততটা জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে ভাষার সূত্র বা ব্যাকরণ-শাস্ত্র শিক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

বাক্য-রচনা শিক্ষা করিবার সময়েই ব্যাকরণের নিয়মগুলি অজ্ঞাতসারে ব্যবহার করা হইয়া থাকে; কিন্তু তখন ব্যাকরণের নিয়মগুলি মুখস্থ করিবার বা জানিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভূত হয় না। কারণ দেখা যায় যে, নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তি এবং শিশুও ভাষা প্রয়োগ করে,—তাহারা অতর্কিতে ব্যাকরণের কতকগুলি সামান্য নিয়ম মানিয়া লইয়াই ভাষা প্রয়োগ করে, তজ্জন্য তাহাদিগের ব্যাকরণের নিয়মসমূহ মুখস্থ করিবার প্রয়োজন হয় না। সেই সকল নিয়ম এত সহজ ও সরল যে তাহা শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত কেবল কথোপকথনচ্ছলে আয়ত্ত হইয়া যায়। শিক্ষা-প্রণালীতেও এই স্বাভাবিক নিয়ম স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষার ইতিহাস। ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষা করিতে করিতেই ভাষার ইতিহাস অনেক পরিমাণে আয়ত্ত হইয়া আসে। ব্যাকরণ-শিক্ষার সময়ে ইহার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই এই কার্য্য সহজে সুসাধ্য হইতে পারে।

চতুর্থ পর্য্যায়—সাহিত্যের ইতিহাস-শিক্ষা। যুগে যুগে যে সকল চিন্তাধারা ও মনোভাব ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত

হইয়া সাহিত্যের বিকাশ, পুষ্টি ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেই ভাবসমূহ এবং তাহাদের প্রকাশকগণের বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষার আন্দোলন ও প্রচারক

আমাদের সমাজে শিক্ষার যথেষ্ট অভাব। প্রথমতঃ, নিম্নশ্রেণী এবং স্ত্রীসমাজ শিক্ষালাভ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রহিয়াছে বলিলেই চলে। ইহাদের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব ও চরিত্র-গঠনের জন্য কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী উপযোগী হইবে তাহা দেশে এখনও বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই; এবং কোন আদর্শ বা প্রণালীই বিস্তৃত বা সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন করা হয় নাই।

শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা

নিম্নশিক্ষার অভাব

শ্রমজীবী ও দরিদ্র সমাজের জন্য নানাস্থানে নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য এখনও তাহার সুচারু বন্দোবস্ত করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব এবং যাহাদিগকে দিবাভাগের সর্ব্বক্ষণই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া পিতামাতার সঙ্গে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়, কেবল তাহারাই নৈশবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের পক্ষে দিনে দুই এক ঘণ্টার বেশী সময় শিক্ষার জন্য ব্যয় করা অসম্ভব।

দরিদ্র সমাজে শিক্ষাবিস্তার

সমাজে এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা যত কম হয়, ততই জাতীয় মঙ্গল—ইহা সত্য। অতি শৈশবকাল হইতেই বালকগণ অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়া মানসিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধন করিবার যোগ হইতে বঞ্চিত হইলে সমাজের মধ্যে একটী প্রধান অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়—ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু যতদিন দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিশেষ-ভাবে না হয় এবং জাতীয় ধনভাণ্ডার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জনসাধারণের বৈষয়িক অবস্থার সচ্ছলতা আনয়ন না করে, ততদিন আমাদের এ অসম্পূর্ণতা থাকিবেই। ততদিন অভিভাবকগণ শিক্ষার উপকারিতা অথবা বিদ্যার অশেষগুণ সম্বন্ধে বিশদরূপে বুঝিতে পারিলেও এ দুঃখ ঘুচাইবার উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন না।

সুতরাং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল মাত্র রাত্রিকালে দুই এক ঘণ্টা শিক্ষালাভ করিতে পারে, এরূপ এক সমাজ থাকিবেই ইহা মানিয়া লইয়া শিক্ষা-সমিতিসমূহের নৈশ-পাঠশালা গঠন করা কর্ত্তব্য। অবশ্য ইহাদের পৈতৃক ব্যবসায় ও দৈনিক জীবনকার্য্যের উপযোগী হয়, এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যাইবে না।

বর্ত্তনান শিক্ষা-পদ্ধতি সমাজের অনুপযোগী

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ পল্লীবাসিগণ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, যে নিয়মে শিক্ষাদান চলিতেছে তাহাতে ছাত্র-দিগের বহু সময় বৃথা নষ্ট হয়, শারীরিক শক্তির হ্রাস হয় এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি থাকে না। শিক্ষার

ব্যবস্থায় অন্নসংস্থানের বিশেষ কোন সুবিধাও নাই। তাহার উপর ছাত্রগণ জাতিগত ব্যবসায় ও গৃহস্থালীর প্রতি অমনোযোগী হইয়া বাবুয়ানা এবং বিলাস শিক্ষা করে,—পৈতৃক জীবিকা অর্জ্জনের উপায় ভুলিয়া গিয়া উদরান্নের চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়ে এবং সমস্ত পরিবারকে দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষিপ্ত করে।

সমাজোপযোগী শিক্ষার লক্ষণ

অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজকে শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে, নূতন আদর্শে পরিচালিত শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহাতে যেন নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি থাকে—

(১) অল্পসময়ে সুতরাং অল্পব্যয়ে অধিক শিক্ষা। আজকাল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে নয় দশ বৎসর না পড়িয়া বালকগণ ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পরীক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে না। অথচ ঐ পরিমাণ শিক্ষা পাঁচ বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যাইতে পারে।

(২) প্রথম হইতেই জাতি-নির্ব্বিশেষে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা।

(৩) পুস্তকের সংখ্যার অল্পতা। শিক্ষা-প্রণালীতে চিত্রাঙ্কন, ভ্রমণ, পর্য্যবেক্ষণ, কাজকর্ম্ম ও বস্তুপরিচয়ের প্রাধান্য।

(৪) ছোট বড়, দীন-দরিদ্র, চাষা-ভদ্র সকলকে একই শিক্ষা-প্রদান এবং এই উপায়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমাজদ্বয়ের মধ্যে অনৈক্য-নিবারণ ও সদ্ভাব-বর্দ্ধন।

(৫) শিক্ষাকে প্রতি গৃহস্থের প্রত্যেক বালকের আয়ত্ত করিবার জন্য অবৈতনিক, অর্দ্ধবৈতনিক বা অল্পবৈতনিক পাঠশালার ব্যবস্থা করা।

(৬) কেবলমাত্র দ্বিপ্রহরে ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বিদ্যা-শিক্ষার সময় নির্দ্ধারণ না করিয়া সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিবার ব্যবস্থা থাকা। ইহাতে ব্যবসায়ীদের সন্তানগণের সুবিধা হয় এবং শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অবসর অনুসারে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করিতে পারে।

(৭) শারীরিক উৎকর্ষ সাধন এবং গ্রামস্থ নানাবিধ উপকার-সাধনের সুযোগ। বই পড়া এবং বিদ্যালয়ে যাওয়াই ছাত্রগণের একমাত্র কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত না হওয়া।

(৮) বিদ্যালয়ের পরিচালনাসম্বন্ধে পল্লীবাসীদিগের মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকা।

উচ্চ শিক্ষায় অসম্পূর্ণতা

বালিকা-বিদ্যালয় এবং নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষা-গণ্ডীর যে বিস্তার সাধিত হয়, তাহার অভাবই কি আমাদের শিক্ষা-সংসারের একমাত্র অভাব? তাহা নহে। যাহাদের শিক্ষালাভ হইতেছে, তাহাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ ও একাঙ্গীন হইয়া থাকিতেছে। শিক্ষাপদ্ধতিতে জাতীয় ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। অধিকন্তু এরূপ অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাভাবিকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কোন ছাত্র

হয়ত পাঠশালার নিম্নশ্রেণী হইতে কলেজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াও সামান্য মাত্র ইতিহাস-শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইল না, আবার কেহ হয়ত তৎপরিমাণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া গেল।

এতদ্ব্যতীত যাঁহারা উচ্চতম শিক্ষালাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের শিক্ষারই বা পরিচয় কোথায়? অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সমাজে উচ্চশিক্ষার প্রভাব কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু কয়জন উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি অনন্যকর্ম্মা হইয়া ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কয়জন বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, কয়জন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া দেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, উচ্চবিদ্যাসমূহ সমাজে সহজলভ্য ও সাধারণের উপযোগী করিবার জন্য কয়জন মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সমগ্র জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন, কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা-প্রণালীর আলোচনা করিয়া শিক্ষাবিস্তার-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন —বেশী চিন্তা না করিয়াও এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলা যায়। আমাদের শিক্ষার অভাবের মধ্যে ইহা একটী কম অভাব নহে। কেবলমাত্র যে শিক্ষাবিস্তারের অভাব তাহা নহে, প্রকৃত উচ্চ-শিক্ষারও অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে।

শিক্ষাবিষয়ক স্বতন্ত্র আন্দোলন

সুতরাং দেশে শিক্ষার অভাব নাই—অথবা অন্যে আমাদের অভাব যথাসাধ্য মোচন করিয়া দিতেছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া

থাকিবার অবসর নাই। উচ্চশিক্ষা, নিম্নশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, লোকশিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষার সকল বিভাগেই মহৎ অভাব আমাদিগকে পদে পদে বেদনা দিতেছে। সুতরাং একমাত্র শিক্ষার জন্যই সমাজে এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নূতন আন্দোলন সৃষ্টি করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যত উপায়ে যতদিক্ হইতে যত বেশী লোক শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমাদের স্বভাব গঠন এবং অভাব মোচন করিতে অগ্রসর হইবেন ততই দেশের উন্নতি হইবে। মনুষ্যত্ব বিকাশোপযোগী শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা সমাজের নীতি, ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এরূপ ভাবিয়া যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই দেশের স্থায়ী মঙ্গলের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা হইয়া অন্যের পথপ্রদর্শক হইবেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক। শিক্ষার আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, ইহার উন্নতি বহুসময়সাপেক্ষ। যাঁহারা অতি শীঘ্র ফললাভের আশা করেন, যাঁহারা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানের সামান্য আরম্ভের মধ্যে নিজেদের সহিষ্ণুতা ও স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহারা এই কার্য্যের যোগ্য নহেন।

(১) মাতৃভাষার অসম্পূর্ণতা

আমাদের অভাবমোচনোপযোগী শিক্ষাবিস্তার অত্যল্পকালের

ভিতরই সাধিত হইবে না। তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ, বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন বহুকালসাপেক্ষ। সুতরাং আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বভাবব্যঞ্জক রূপে গড়িয়া তুলিয়া শিক্ষা-পদ্ধতির সকল স্তরে ইহার সাহায্যে বিদ্যাদান করা দু'এক বৎসর বা দু'এক জনের কার্য্য নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ অল্প শ্রমে সাধিত হইবে না। বহু বক্তির সমগ্র জীবন-ব্যাপী সমবেত চিন্তা ও আলোচনার ফলেই এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

(২) স্বাধীন জীবিকার অভাব

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া উন্নত উপায়ে ছাত্রগণের জন্য স্বাধীন অন্নের ব্যবস্থা করা এক পুরুষের সাধ্যাতীত। আমাদের দেশে আজকালকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-শিল্প-ব্যবসায়াদি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—পুরাতন প্রথাগুলিও সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। আজকাল বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীসমূহ আয়ত্ত করিবার জন্য দেশের কতিপয় লোক বিদেশে শিক্ষা লাভ করিতে যাইতেছেন মাত্র। এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণ ফিরিয়া আসিলেই দেশে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে শিল্প-কারখানার প্রতিষ্ঠা সুসাধ্য হইবে না, এবং ব্যবসায়ে লাভবান হইবার চেষ্টা ফলবতী হইবে না। কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় দুই চারিজন লোকের মধ্যে সেই উচ্চশিল্প-বিদ্যা আবদ্ধ থাকিবে মাত্র। তাহা-দিগকেই বিশ্বাস করিয়া দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মূলধন ব্যয়

করিতে বেশী সাহসী হইতে পারেন না। ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন, অর্থাৎ জীবিকা-অর্জ্জনের নূতন নূতন পন্থাসমূহের প্রভাব সমাজে বড় শীঘ্র লক্ষিত হইবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের এখন শৈশব বা প্রারম্ভিক অবস্থা মাত্র।

অথচ দেশের মধ্যে ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি সাধিত না হইলে শিল্প-শিক্ষার সুবিধা হয় কি করিয়া? সমাজে কৃষিক্ষেত্র, ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান এবং শিল্প-কারখানার সংখ্যা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি না পাইলে শিল্প-ও-ব্যবসায়-বিদ্যালয়ের আদর হইবে কেন? কাজেই শিল্প-কৃষি-ব্যবসায় শিক্ষার প্রতি অল্পকালের মধ্যে এ দেশের লোক আকৃষ্ট হইতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্প-বিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয় ইত্যাদিতে যথেষ্ট মেধাবী ছাত্র জুটিতে পারে না।

অভিভাবকগণ যদি এই সকল নূতন বিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠাইতে উৎসাহী না হন তাহা হইলে বিদ্যালয়গুলির পুষ্টিই বা হইবে কোথা হইতে? সুতরাং আমাদের অভাব-মোচনোপযোগী যথার্থ শিক্ষার আন্দোলন শীঘ্র ফলদান করিতে পারিবে না। এজন্যই "জাতীয় শিক্ষা"র ব্যবস্থায় কৃতকার্য্যতা এখনও দেখা যাইতেছে না।

(৩) জ্ঞানানুশীলনে আন্তরিকতার অভাব

তৃতীয়তঃ, সমাজে বিজ্ঞানচর্চ্চা এবং ইতিহাসালোচনার প্রতিষ্ঠা দেখিতে হইলেও বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। যাঁহারা এ সকল বিষয়ে অগ্রগামী হইয়াছেন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত

এবং অধিকসংখ্যক বিদ্যানুরাগী ছাত্র অনন্যচিন্তরূপে সমবেত হইলেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার যুগ উপস্থিত হইতে পারে।

কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। মধ্যবিত্তশ্রেণী অন্ন-চিন্তায় জর্জ্জরিত। অন্নচিন্তা দূর করিবার জন্য ধনী মহাত্মারা অগ্রসর হইলেই মৌলিক অনুসন্ধান ও গবেষণা-সমিতিগুলি পুষ্ট হইতে পারে। অথবা মধ্যবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত সমাজে সর্ব্বত্যাগী ভাবুকগণের আবির্ভাব হইলেই মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তার আন্দোলন সহজে চলিতে পারে।

কিন্তু ধনী ও পণ্ডিত সমাজদ্বয় হইতে এরূপ নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী বেশী পাওয়া যাইবে কি? এখনও দেরী আছে। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রের লোকাভাব শীঘ্র যে পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করা যায় না।

শিক্ষা-বিস্তারকল্পে 'কন্‌স্ক্রিপ্‌শন্‌'

যাহা হউক, শিক্ষাক্ষেত্রের নানাবিধ অভাব মোচনের জন্য লোকসংগ্রহ এবং কর্ম্মী সৃষ্টি করা আবশ্যক। এজন্য ধুরন্ধর ও প্রবর্ত্তকগণকে বিশেষ এক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন কোন দেশে সমরবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য "কন্‌স্-ক্রিপ্‌শন্‌"-প্রথা প্রচলিত আছে। তাহার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সামরিক জীবন গঠন করিয়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

আমাদের সমাজে শিক্ষাবিষয়ে সেইরূপ কোন প্রথা অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না ভাবিবার বিষয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লেখা পড়া শিখিয়া বাহির হইতেছেন, তাঁহারা যদি অন্ততঃ এক বৎসর কাল শিক্ষাপ্রচার কল্পে পল্লীতে পল্লীতে জীবন অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে সমগ্র সমাজে কর্ম্মের ধারা ও চিন্তাস্রোত সজীবভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। প্রত্যেক বৎসরই নূতন নূতন কর্ম্মী আসিয়া পুরাতন কর্ম্মীদিগের আরব্ধ সেবা-কার্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। অথচ কোন একজনকে এক বৎসরের অধিককাল স্বার্থত্যাগ করিতে হইল না।

ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক বিশেষ এক শ্রেণীর শিক্ষক ও প্রচারক প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

শিক্ষাপ্রচারক-সৃষ্টি

যাঁহারা এই পদ্ধতি অনুসারে জীবন গঠন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সাধারণ শিক্ষার্থিগণের ন্যায় কোনও বিদ্যালয়ে যাইয়া লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই। বরং নানা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদিগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণের নানা ভাবে শিষ্যত্ব-গ্রহণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিবিধ সৎকার্য্যে যোগদান এবং বিচিত্র কার্য্যাধ্যক্ষগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা লাভ হইবে। অবশ্য এইরূপ কার্য্য করিবার সময়েই অবসরমত যথোচিত গ্রন্থাদি পাঠও করিতে হইবে।

(ক) কর্ম্মজীবনের প্রাধান্য

যে সমুদয় কর্ম্মে সহায়তা করিয়া জীবন গঠন করা প্রয়োজন হইবে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

১। ল্যাবরেটরী ও বিজ্ঞানগৃহের কেরাণী, য়্যাসিষ্টাণ্ট, ডিমন্‌ষ্ট্রেটর, হিসাবরক্ষক প্রভৃতির কার্য্য ;

২। বিবিধ কৃষি-শিল্প-ব্যবসায়-কারখানার ঐরূপ কার্য্য ;

৩। আফিস ও কার্য্যালয়ের কেরাণী, হিসাবরক্ষক, পরিচালক প্রভৃতির কার্য্য ;

৪। ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগের তত্ত্বাবধানে বিচিত্র স্থানে ভ্রমণ ও বিচিত্র তথ্যসংগ্রহ ;

৫। লোকহিতকর বিবিধ সদনুষ্ঠানে যোগদান ;

৬। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, গ্রন্থকার, সংবাদপত্রের সম্পাদক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধানকারী, প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতির সহায়তাকারীর কার্য্য ;

৭। অনুবাদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধলিখন, গ্রন্থাদির সারাংশ-সঙ্কলন, রিপোর্ট, বিবরণী-প্রকাশাদি সামান্য ও সহজ সাহিত্য-সংক্রান্ত কার্য্য ;

৮। নিম্ন-বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতিতে অধ্যক্ষতা ও শিক্ষকতার কার্য্য ;

৯। ছাপাখানা ও গ্রন্থপ্রকাশসংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য।

এইরূপ বিচিত্র কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া সকল শিক্ষাপ্রচারকের শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেককেই সর্ব্ববিধ কার্য্যে ব্যুৎপন্ন হইয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। এই সকল কার্য্যে নানা-শ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। যাহাতে শিক্ষার্থীরা কর্ম্মকেন্দ্রের নিম্নতম পদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পদের অধিকারী হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সকল বিষয়ে যাহাতে প্রত্যেকের বিবিদিষা জন্মে এবং সকলপ্রকার কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি বিকশিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলের মধ্যে এই কার্য্যগুলির বিভাগ ও পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

(খ) গ্রন্থ পাঠ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী, ফ্যাক্টরী, কারখানা, ছাপাখানা, আফিস, বিদ্যালয় প্রভৃতি কর্ম্মকেন্দ্রে বিবিধ কার্য্য করিবার অবসরকালে শিক্ষাপ্রচারকগণ মানসিক উৎকর্ষ-সাধনোপযোগী গ্রন্থপাঠও করিতে থাকিবেন। এজন্য উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে অল্প কালের মধ্যে যাহাতে তাঁহাদের বহু পরিমাণ শিক্ষালাভ হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগকে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার সময়ে যথোচিত পুস্তক ও ল্যাবরেটরীর সাজসরঞ্জামাদি প্রদান করা আবশ্যক। এইরূপে যে সমুদয় বিষয় শিক্ষা করা প্রয়োজন নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

১। সংস্কৃত সাহিত্য
২। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার গণিত
৩। পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন
৪। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞান
৫। অঙ্কন ও চিত্রবিদ্যা
৬। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাস
৭। প্রাথমিক ধনবিজ্ঞান
৮। কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রশাসন-প্রণালী
৯। ইংরাজী সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস

এই সকল বিষয়ে অত্যুচ্চ বা গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, ইণ্টারমিডিয়েট মানের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ এবং বি, এ, পরীক্ষার কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমাণ জ্ঞানলাভ হইলেই যথেষ্ট।

(গ) বিদেশে জীবনযাপন

চারি বৎসর কাল এই ভাবে কার্য্য ও গ্রন্থপাঠ করিতে হইবে। কোনও বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহার পর এই শিক্ষাপ্রচারকদিগকে বিদেশে প্রেরণ করিয়া শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যাহারা ইংরাজী ভাষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগকে জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সে, এবং যাহারা ইংরাজীতে বিশেষ পারদর্শী হইবে না তাহাদিগকে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পাঠাইতে হইবে।

বিদেশে দুই তিন বৎসর কাল থাকা প্রয়োজন। সেখানেও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীর ন্যায় শিক্ষা লাভ না করিলেও চলিতে পারে। উপযুক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরীতে বসিয়া অথবা গৃহেই গ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইবে। তবে যে সকল বিষয়ে হাতে কাজ করিলে ফল ভাল হয়, সেই সকল বিষয়ের জন্য special student, external candidate অথবা apprenticeএর ন্যায় ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কসপ প্রভৃতিতে কর্ম্ম করিলেই চলিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত কোন কোন বিষয়ের theoretical lessonsএর জন্য বিদ্যালয়ের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ শিক্ষা-প্রদান করেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। বিদেশে থাকিয়া শিক্ষার্থীরা যাহাতে এরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

এই দুই তিন বৎসরের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারককে কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, specialist বা expert করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। যাহাতে প্রত্যেকেই নানা বিষয়ে মনোযোগী হইয়া বিদেশীয় চিন্তা ও শিক্ষাপদ্ধতির বিশিষ্ট গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কেবল তাহারই বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। তবে সেই সঙ্গে কোন একটি বিশেষ শিল্প, ব্যবসায় বা বৈজ্ঞানিক কার্য্য-প্রণালীর মূল কথাগুলি যাহাতে আয়ত্ত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত। সেই সকল বিষয়ে

কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রি লাভ করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।

শিক্ষা-প্রচারকের কর্ম্ম

শিক্ষাপ্রচারক তৈয়ারী করিবার জন্য ছয় সাত বৎসরব্যাপী জীবন-যাপনের প্রণালী বিবৃত করা হইল। এই কয় বৎসর শিক্ষা-লাভের ফলে তাহাদের কোনও এক বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা জন্মিবে না। কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রয়োজন-সাধনোপযোগী সাহস ও নৈপুণ্য জন্মিবে এইরূপ আশা করা যায়। তখন হইতে এইরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকগণ বিচিত্রস্থানে বিচিত্রকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইবেন।

অল্পবেতনে উপযুক্ত কর্ম্মীরা কার্য্য করিলে সমাজে বহুবিধ আন্দোলন এক সঙ্গে সহজেই চলিতে পারিবে। কার্য্যের ফলে প্রচারকগণের নিজেরও অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। অধিকন্তু, সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে অনন্যকর্ম্মা ও নৈষ্ঠিক প্রচারকগণের কার্য্যাবলী প্রচারিত হইতে থাকিবে। ফলতঃ, কার্য্য ও চিন্তার নূতন নূতন পন্থার প্রতি সমাজের বিশ্বাস সৃষ্ট হইবে।

এই প্রণালীতে শিক্ষিত কর্ম্মিগণ দ্বিবিধ কর্ম্ম করিবেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বিভিন্নদেশে এদেশবাসীর কর্ম্ম ও চিন্তা করিবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য চেষ্টিত হইবেন; এবং হিন্দুসাহিত্য ও দর্শন প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি

বিদেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের দৃষ্টি যাহাতে আকৃষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; এবং ভারতীয় বিদ্যাগুলি ও আমাদের সমাজের বিবরণ যাহাতে বিভিন্নদেশীয় ছাত্রবৃন্দের অবশ্য-পাঠ্যের মধ্যে নির্ব্বাচিত হয়, তাহার আয়োজনকল্পে তত্রত্য সুধীমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বক্তৃতা, আলোচনা ও শিক্ষকতা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল নূতন বিদ্যা বিদেশে শিক্ষা করা হইয়াছে, বিদেশবাসের ফলে যে সকল নূতন বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, এবং বিভিন্ন সভ্যদেশে দর্শন বিজ্ঞানাদি বিভাগে যে সকল উন্নত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমুদয় বিষয় মাতৃভাষায় আলোচনা, অনুবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা করিবার জন্য মনোযোগী হইতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত, এদেশে যে সমুদয় ব্যবসায়, বাণিজ্য, কারখানা, বিদ্যালয়, ল্যাবরেটরী প্রভৃতি সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, এবং শিল্পবিষয়ক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে তাহাদিগকে রক্ষা ও পুষ্ট করিবার জন্য লাভালাভ-নিরপেক্ষ হইয়া এবং সমাজের সাহায্য ও সহানুভূতির আশায় বসিয়া না থাকিয়া কয়েক জনকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

জেলায় জেলায় ভ্রমণ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে বাস করাও এই প্রচারকগণের প্রধান কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে। তাঁহারা পল্লীর কৃষিজীবী এবং শিল্পীদিগকে শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিভিন্ন কার্য্যকরী প্রণালীসমূহ হাতেকলমে পরীক্ষা দ্বারা দেখাইবেন। এই উপায়ে সাময়িক প্রদর্শনীর ফলসমূহ স্থায়ী আকার লাভ করিতে পারিবে।

অধিকন্তু, মৌলিক অনুসন্ধান, স্বাধীন গবেষণা, বিজ্ঞানালোচনা, ইতিহাসের তথ্যসঙ্কলন এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বিষয়ক পরীক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের জন্যই কতিপয় লোকের সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক।

এই সকল বিষয় সর্ব্বদা মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে বিভিন্ন ভাষায় যাহাতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হ্ তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে; এবং প্রয়োজন হইলে স্বতঃ পত্রিকা, পুস্তিকা, নিবেনপত্র ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া লোক শিক্ষার সাহায্য করিতে হইবে।

আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি

শিক্ষা-সমাজ

সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অথবা আর্থিক কোন আন্দোলন, অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন শিক্ষা-সমিতি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্যভাবে সংশ্রব থাকা উচিত নহে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ও শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণের পরিচালনায় বিদ্যাদান ও শিক্ষাবিস্তারই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে—

(ক) বিবিধ উপায়ে শিক্ষা বিস্তার করা,

(১) নিম্নশিক্ষাকে যথাসম্ভব অবৈতনিক করা,

(২) স্থানে স্থানে নৈশ-বিদ্যালয়, লাইব্রেরী, গ্রন্থশালা প্রভৃতি স্থাপন করা,

(৩) বালিকাদিগের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা,

(৪) সাহিত্য, বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রভৃতি শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ, পত্রিকা বা পুস্তিকাদি প্রকাশ করা,

(৫) শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ অথবা প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার দ্বারা সমাজে বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলন উৎসাহিত ও বিস্তৃত করা।

(খ) শিক্ষকদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা—এই উদ্দেশ্যে নিম্ন-লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সুফল লাভ হইতে পারে—

(১) ইঁহাদিগকে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত ব্যক্তি বা সুধীমণ্ডলী প্রভৃতি বিদ্যার জীবন্ত উৎস ও কেন্দ্রস্থানে প্রেরণ।

(২) ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-কার্য্যের জন্য উপযুক্ত ধুরন্ধরগণের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ।

(৩) বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়াদির শিক্ষাপ্রণালী ও কার্য্য-নির্ব্বাহ প্রভৃতি পরিদর্শনের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা।

(৪) বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ও বিজ্ঞানালয়ের উন্নতিসাধন করিয়া স্বক্ষেত্রে উন্নত চিন্তা ও গবেষণার সহায়তা বিধান।

(৫) প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্যক্তিগণের শুভাগমনের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ।

(গ) শিক্ষকদিগের দ্বারা নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ে মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করাইয়া অধ্যাপনা-কার্য্যের সুবিধা এবং জাতীয় সাহিত্য ও জ্ঞানভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন।

মানসিক শিক্ষার পর্য্যায়

(১) কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রকে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং শিল্প এই ত্রিবিধ বিষয়ই শিক্ষা করিতে হইবে। এই সময়ের

বহু বিষয়

মধ্যে কয়েক বিষয় বর্জ্জন করিয়া অপর কয়েক বিষয় বাছিয়া লইতে দেওয়া উচিত নহে। নিম্নশিক্ষা এইরূপে সর্ব্বতোমুখী হইলেই ভিত্তি দৃঢ় ও বিস্তৃত হয়, এবং উচ্চশিক্ষা সুফল প্রদান করে।

(২) ইহার পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থায় ছাত্রদিগের কৃতিত্ব অথবা বিশেষ অভিরুচি অনুসারে পাঠ্যের বিষয় বাছিয়া লইতে দেওয়া উচিত; কিন্তু তখনও

কয়েকটি বিষয়

কেবল একটি মাত্র বিষয় গ্রহণ করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। যে ছাত্র সাহিত্যে নিপুণ তাহাকে সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট এবং সহায়তাকারী আরও দু'একটী বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। বিজ্ঞানে যাহার অভিরুচি ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আরও কয়েকটী বিষয় গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৩) সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে কেবলমাত্র একটী বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। পূর্ব্বে ছাত্রেরা যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করিয়াছে,

একমাত্র বিষয়

এক্ষণে তাহার মধ্য হইতে বিশেষ একটি বিষয় বাছিয়া লইয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষাপ্রণালী

ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বড় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিলেই মানুষের মন গঠিত ও বুদ্ধি বিকশিত হয়। বাধা ও কষ্ট দূর করিবার যত চেষ্টা করা যায়, মনের শক্তি এবং দৃঢ়তাও তত বাড়িয়া থাকে।

তাই লেখা পড়া সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত যে, বই যে পড়িতেই হইবে তাহা নহে—আলোচ্য বিষয়গুলি ভাল করিয়া বিচার করিতে পারিলেই হইল। এই প্রণালীতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে, এবং ইহাতে দুই একখানি পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ছাত্রেরা শিক্ষকের সাহায্যে একই বিষয় নানা উপায়ে নানা মতের ভিতর দিয়া বুঝিয়া দেখিবার সুবিধা পায়।

স্বাধীন আলোচনা

এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, পদার্থ-বিজ্ঞান, ভাষা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই এক নূতন ভাবে মনে স্থান পায়। ছাত্রের নিজেরও কিছু কিছু চিন্তা করিবার সুযোগ থাকে। এজন্য এইরূপ লেখাপড়ার ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কেবল ভাব-জগতের কর্ত্তা না হইয়া বাস্তবের প্রতিও দৃষ্টি পড়ে। এইজন্য দেশবিদেশে ভ্রমণ, নানা প্রকার লোকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান, বস্তুসমূহের সহিত পরিচয় ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞানকে সবল ও দৃঢ় করিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

আর দুই চারি খানি বাঁধা বই না পড়িয়া জ্ঞাতব্য বিষয়টী আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে আর একটা প্রধান লাভ হয়। ছাত্রেরা যখন বই পড়ে, তখন তাহারা যে কেবল পরকীয় রচনাগুলি পড়িতেছে এ ভাব মনে থাকে না। লেখক কি ভাবে লিখিয়াছেন—গ্রন্থকার কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন—কত উপায়ে

গ্রন্থ-নির্দ্দেশ-রীতি বর্জ্জন

কোন্ কোন্ "context" এ একই বিষয়ের অবতারণা করা যায় ইত্যাদি লেখার পদ্ধতি ও লেখকের মূল মন্ত্রগুলি পর্য্যন্ত স্ববশ হইয়া আসে। তাহার ফলে পরের লেখা পড়িতে পড়িতে নিজেরও লিখিবার ইচ্ছা ও শক্তির উদ্রেক হয়। "কেবল গ্রহণই না করিয়া পরকেও কিছু দিব"—এই উচ্চ আশা মনে স্থান পায়। তখন অনুসন্ধিৎসু হইয়া জ্ঞানের অন্বেষণে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্তি জন্মে।

ইহার ফলে নিজেদের ইতিহাস, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি কোন বিষয়ই আর পরের চোখে দেখিতে ইচ্ছা থাকে না। স্বদেশের জাতীয় সম্পদ নিজেদের চোখে কিরূপ দেখায় তাহা বুঝিতে উৎসাহ হয়। তখন পরকীয় ভাবগুলি নিজের ভাষায় অনুবাদ মাত্র করিয়া বা অপরের কথার সারাংশ অল্প কথায় নিজে লিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায় না। বরং সংসারের কার্য্য ও ঘটনাবলী, সকল প্রকার চিন্তাস্রোত ও কর্ম্মের আন্দোলন, এবং সকল প্রকার দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তুর মধ্যে থাকিয়া শিক্ষালাভের সার্থকতা উপলব্ধি হইতে থাকে। অধিকন্তু, প্রশ্নের পর প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থী মানব-জগৎ ও জড়-প্রকৃতির লুক্কায়িত ভাণ্ডার হইতে অমূল্য তথ্যের আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হয়। যথার্থ সত্য নির্ণয় করিয়া এক একটী বিজ্ঞান সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে।

(ক) বিনা পুস্তকে সকল শিক্ষা

যথাসম্ভব পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা উচিত। অবশ্য ভাষা-শিক্ষার জন্য উপযুক্ত সময়ে কয়েকটী

মৌখিক শিক্ষা

সাহিত্য-রস-যুক্ত পুস্তক ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে নিম্ন-শ্রেণীতে ভাষার প্রধান প্রধান নিয়মগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। কথা বলিয়া ও বাক্য রচনা করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে করিতে এবং মুখে মুখে ভাষা ব্যবহার করিতে করিতে ব্যাকরণের নিয়মগুলি আয়ত্ত হইয়া আসে। ইহাতে ভাষা-শিক্ষা সহজ ও সজীব হয়।

ইতিহাস শিখাইবার জন্য নিম্নশ্রেণীতে কথকতার সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। গল্পের ভিতর দিয়া সমগ্র ইতিহাস-কথা প্রচার করাই সঙ্গত। জাতীয় জীবনের স্তম্ভস্বরূপ প্রধান প্রধান ঘটনা, আন্দোলন ও মহাপুরুষদিগের কাহিনী শিখান কর্ত্তব্য। উচ্চ শ্রেণীতে কেবল একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ, বা টেক্স্ট্ বুকের উপর নির্ভর করা বাঞ্ছনীয় নয়। বিবিধ মৌলিক পুস্তকের সার-সঙ্কলন দ্বারা শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন-বিজ্ঞান এই চারি প্রকার বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত। এজন্য আদৌ পুস্তকের ব্যবহার করিতে হইবে না। ছাত্রেরা বিজ্ঞানালয়ে পরীক্ষা করিবে, উদ্যানে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ স্বয়ং নিরীক্ষণ করিবে, এবং জীব-শরীরের বিভিন্ন অবয়বের নমুনা দেখিবে। তাহাদিগকে ভেক-ছাগলাদির অঙ্গচ্ছেদও করিতে হইবে। অধিকন্তু অস্থি-বিদ্যা-বিষয়ক এবং জীবজগৎ

'হাতে কলমে' কাজ

সম্বন্ধীয় মানচিত্র নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রকৃতির বিবিধ অভিব্যক্তির সহিত যাহাতে শিক্ষার্থিগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও বিধেয়।

সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ছাত্রদিগকে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। এজন্য সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ চিত্র অঙ্কনের ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। এতদ্ব্যতীত সূত্রধর এবং তন্তুবায়ের কর্ম্মও সকলেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার দ্বারা হস্ত-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নৈপুণ্য জন্মিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

(খ) শিক্ষালয়ে বিশ্বশক্তির পরিচয়

শিক্ষা-প্রণালীর গুণে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের বাহুল্যে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না—বরং বিষয়গুলি পরস্পরসম্বদ্ধ বলিয়া উপকারই হইয়া থাকে।

শিক্ষার বহুমুখীনতা আবশ্যক

সময়-বিভাগ এমন ভাবে নির্দ্ধারিত করা উচিত যাহাতে ছাত্রেরা অতি সহজেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারে। ইহাতে দৈনিক শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় কিছু অধিক হইলেও শিক্ষার্থীদের মানসিক শৈথিল্য জন্মে না। বিজ্ঞান-গৃহে বস্তুপরীক্ষা; কারখানায় কৃষিক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কর্ম্ম; চিত্রাঙ্কণে মনোনিবেশ; এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ; অথবা তাহাদের বিবরণ-শ্রবণ এই সকল আমোদজনক কার্য্য যদি

ভ্রমণ, অঙ্কন কথোপকথনজনিত আনন্দ

শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে ছাত্রজীবন অতি সুখময় হইয়া উঠে। বিশ্বের সহিত পরিচিত হইবার এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে গণিত এবং সাহিত্য-শিক্ষার সময়ে ছাত্রদিগের অবসাদ বা শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় না। সমগ্র জগৎকেই শিক্ষালয় বিবেচনা করিতে বেশী কষ্টবোধ হয় না।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যাধিক্য হইলেও ছাত্রদিগের পক্ষে এই শিক্ষাপদ্ধতি আনন্দদায়ক ও প্রীতিকর বোধ হইতে থাকে। কারণ

গ্রন্থের অল্পতা

এ নিয়মে ছাত্রেরা পুস্তকের ভারে আক্রান্ত হয় না। তাহাদের পুঁথি মুখস্থ করিবার প্রয়োজন বেশী হয় না। সুতরাং তাহারা বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ ক্লেশ বোধ করে না।

বিদ্যারম্ভের কাল হইতেই বয়ঃক্রম ও চিন্তাশক্তির উপযোগী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে সুফল লাভ হয়। বাহ্যজগতের প্রকৃতি ও পরিবর্ত্তনগুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের সম্যক্ অনুশীলন হইতে থাকে। মুদ্রিত পুস্তক আবৃত্তির পরিবর্ত্তে প্রকৃতি-গ্রন্থপাঠ এবং বিজ্ঞানাগারে পদার্থ সমূহের গুণ-বিচার ও কৌতুকোদ্দীপক পরীক্ষার ফলে চিত্তে স্ফূর্ত্তি জন্মে।

এদিকে প্রধানতঃ মাতৃভাষার সাহায্যে নিম্নশ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রদান করিলে শিক্ষা দুরূহ না হইয়া সহজ হয়।

মাতৃভাষার সৌকর্য্য

যাহা শিক্ষা করা যায় তাহা কেবল বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয় না এবং ভাষাগত হইয়া থা

না। বিদ্যা বস্তুগত এবং জীবন্ত হইয়া প্রকৃত বাস্তব জীবনের বিবিধ অভাবমোচনে সাহায্য করে। অধিকন্তু, শিক্ষা অল্পায়াস-ও অল্পসময়, সুতরাং অল্পব্যয়-সাধ্য হয়।

(গ) টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মানুসারে শিক্ষার্থীরা বৎসরান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই গৌরব প্রাপ্ত হয়। বৎসরের প্রতিদিন বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী না হইলেও ছাত্রদিগের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এই রীতি বর্জ্জন করা উচিত।

যাহাতে ছাত্রেরা প্রতিদিনই প্রতিদিনকার পাঠ সমাধা করিয়া ফেলিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

দৈনিক পরীক্ষাপদ্ধতি

ছাত্রদিগকে দৈনিক কার্য্যে মনোযোগী হইতে বিশেষ উৎসাহিত করা আবশ্যক। তাহাদের চরিত্রের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার অভ্যাস ও স্থির জ্ঞান-পিপাসা সৃষ্টি করিবার জন্য দৈনিক পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রতিদিন ছাত্রদিগের পাঠের ফল নির্দ্ধারণ করিয়া একটি পুস্তকে লিখিয়া রাখা উচিত। বৎসরান্তে এই দৈনিক পরীক্ষার ফলসমূহ যোগ করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বৎসরান্তে ছাত্রদিগের উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার সময় উচ্চ-নীচ স্থান এক নূতন নিয়মে নির্দ্ধারিত হইবে। বাৎসরিক ফল কেবল মাত্র ৩।৪ দিনের

ক্রমাগত কয়েক-ঘণ্টা-ব্যাপী পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা নির্দ্ধারিত না হইয়া বৎসরের সমগ্র কার্য্য-সমষ্টির উপর নির্ভর করিবে।

প্রতিবৎসরে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে বাৎসরিক ফলানুসারে পারিতোষিক বিতরণ করা আবশ্যক। যে নূতন প্রণালী বিবৃত হইল, তদনুসারে ফল নিরূপিত হইলে অনেক সময়ে শেষ বাৎসরিক পরীক্ষায় যে ছাত্রেরা উচ্চস্থান অধিকার করে, তাহারাই সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিকের অধিকারী হইবে না। শেষ পরীক্ষায় নিম্নস্থান অধিকার করিয়াও যদি কোন ছাত্রের সমগ্র বৎসরের কার্য্যফল সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলেও তাহাকে উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হইবার অধিকার দেওয়া উচিত।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষকেরাই পরীক্ষক ভাবে সমাজে গৌরব ও মর্য্যাদা লাভ করিতে থাকেন। যাঁহারা বিদ্যা দান করিতেছেন, তাঁহারাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ন্তা এবং ভাগ্যগঠনের কর্ত্তা হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ইহাতে ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র, ডিগ্রি অথবা অন্য কোনও সম্মান-বিজ্ঞাপক লিপি-প্রদানের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে; এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষামন্দির না থাকিয়া প্রকৃত পাঠশালা ও শিক্ষালয়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। এইরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট জ্ঞান-মন্দিরকে "টীচিং বিশ্ব-বিদ্যালয়" বলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন

(ঘ) শিক্ষালয় ও সমাজ-জীবন

সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মে অভিভাবকেরা ছাত্রদিগের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। বৎসরান্তে সন্তানদিগের উচ্চশ্রেণীতে উঠিবার কৃতকার্য্যতা বা অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন মাত্র। কিন্তু অভিভাবকদিগকে ছাত্রগণের শিক্ষার ফল জানাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। দৈনিক পরীক্ষার ফলসমূহ প্রতিমাসের শেষে অভিভাবকগণের নিকট একখানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-পত্রে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

অভিভাবক ও শিক্ষালয়

বিদ্যালয়ের অধীনে ছাত্রদিগের একটী আলোচনা-সভা থাকিলে উপকার হয়। সপ্তাহে কয়েকবার বিদ্যালয়ের অবকাশকালে সম্মিলনীর অধিবেশন হইতে পারে। শিক্ষকগণও ঐ সভায় উপস্থিত থাকিবেন। ছাত্রেরা ইতিহাস, বিজ্ঞান বা নীতি-সম্বন্ধীয় কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে স্বচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা করিবে। শিক্ষকগণের ও এই সকল বিষয়ে ছাত্রদিগকে মৌখিক বা লিখিত উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষক-ও ছাত্র-সম্মিলন

এই প্রবন্ধ বা বক্তৃতাসমূহ সংগ্রহ করিলে বিদ্যালয়ের অধীনে পাক্ষিক বা মাসিকপত্র চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত এই সমিতির অধিবেশনে বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরাও যোগদান করিতে পারে। এই উপায়ে

পুরাতন ছাত্র

তাহারা নিজ পঠদ্দশার সূত্র বৃদ্ধি করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রের জীবনব্যাপী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে। বাস্তবিক ইহার ফলে বিদ্যালয়ই যে শিক্ষার্থীর ভাগ্য-গঠনের কর্ত্তা, এবং বিদ্যালয়ের চতুঃসীমা ত্যাগ করিলেই শিক্ষার্থীর বিদ্যাচর্চ্চা শেষ হয় না, এই ধারণা সমাজে বদ্ধমূল হইতে পারে।

সমাজের অভাব অভিযোগ অনুসারে শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইবার সম্ভাবনাও থাকিবে। জনসাধারণের রীতিনীতি এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আশা-আকাক্ষা ইত্যাদি বুঝিয়া শিক্ষাপ্রচারকগণ শিক্ষাপদ্ধতির যথোচিত পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। সমাজের জীবন ধারা, চিন্তাস্রোত এবং কর্ম্মপ্রবাহের সঙ্গে শিক্ষালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। শিক্ষালয় প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ-জীবনের একটা প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়িবে।

নৈতিক শিক্ষা

ছাত্রের চরিত্র গঠন করিতে হইলে তাহাকে ত্যাগের পথে চলিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে যে কাজে কিছু ক্ষতিস্বীকার করিতে হয়, যে কর্ম্ম-কেন্দ্রে থাকিলে পরের জন্য একটু একটু খাটিবার অভ্যাস জন্মে, যে সকল কার্য্যক্ষেত্রে পরোপকার করিবার সুবিধা পাওয়া যায়, সেই সকল আবেষ্টনের মধ্যে শিক্ষার্থীর জীবন যাপন আবশ্যক।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে ছাত্রকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। তাহার ফলে ব্রহ্মচারীরা কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বা নৈয়ায়িক হইয়া বাহির হইতেন না—সেখানে সংযম, শৌচ, কর্ত্তব্যপালন ও কর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সকল প্রকার মানুষোচিত গুণলাভের সঙ্গে শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিত। গুরুগৃহের আবহাওয়াতেই পরসেবা, অহঙ্কারনাশ, ভক্তিশ্রদ্ধা ইত্যাদি নৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান বীজ থাকিত।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা

আমাদের আজকালকার অবস্থায়ও ছাত্রদিগের জন্য এই সংযম-পালন ও পরার্থে জীবনযাপনের সুবিধা করিয়া না দিতে পারিলে বিদ্যাশিক্ষার ভিত্তিই গঠিত হইবে না। তাই পঠদ্দশাতেই সমাজের বিবিধ কাজের প্রতি মন যাহাতে আকৃষ্ট হয় তাহার আয়োজন করা আবশ্যক। সমাজের বিভিন্ন প্রকার অভাবমোচনের ছোট ছোট আয়োজন যাহাতে শিক্ষার্থিগণ নিজেরাই করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টিত থাকা প্রয়োজন। এইরূপ ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিলে মনুষ্যত্ব-গঠনোপযোগী উপাদান সংগৃহীত হইবে। নিঃস্বার্থ কাজই নৈতিকজীবন-গঠনের প্রধান উপকরণ এবং ধর্ম্মজীবনের অবলম্বন।

স্বার্থত্যাগ শিক্ষাপ্রদানোপযোগী কর্ম্মকেন্দ্র

মানুষকে সংসারে প্রবেশ করিয়া পরিবার-পালন, পরোপকার, ধর্ম্মচিন্তা, সন্তানসন্ততির বিবাহ, ভিক্ষুককে অন্নদান, রোগীর

গৃহস্থের জীবন

শুশ্রূষা ইত্যাদি অনেক প্রকার কাজ করিতে হয়। "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" অর্থাৎ পশুসেবা, অতিথি-সেবা, দেবসেবা ইত্যাদিই গৃহস্থের নিত্য ধর্ম্ম। অর্থ-সঞ্চয়ই এক-মাত্র কর্ত্তব্য থাকে না। কারণ মানুষ কেবল ভোগীই নয়। অনেক সময় ইচ্ছায় হ'ক অনিচ্ছায় হ'ক তাহাকে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। আবার দেবপূজা ও ব্রতানুষ্ঠানাদিই তাহার একমাত্র কর্ম্ম থাকে না। বৈষয়িক ব্যাপারেও মানুষ মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়। তাহার মনুষ্যত্ব কেবল শরীর বা কেবল আত্মা লইয়া নহে। সুতরাং একমাত্র উদরান্নের চিন্তা বা কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাই জীবনের ব্রত হইতে পারে না। সমাজের সাধারণ মানুষকে সকল প্রকার কাজই করিতে হয়।

ছাত্র-জীবনের কর্ত্তব্য

অতএব যে বয়সে ছাত্র সেই ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন হইতেই এই সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মের দিকে তাহার লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মানুষ যদি কেবল একপ্রস্থ কাপড় বা একথালা ভাত বা কেবল জপমন্ত্র হইত, তবে পঠদ্দশায় কেবল টাকাকড়ির বিদ্যা বা ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িলেই চলিত। কিন্তু মানুষ নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়ের ও প্রবৃত্তির সমবায়ে সৃষ্ট, তাই তাহার সকলকেই চরিতার্থ করিতে হয়। এই কারণে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল অর্থসংগ্রহই হইতে পারে না। মানুষকে ভবিষ্যতে সামাজিক, পারিবারিক, ধর্ম্মবিষয়ক, আর্থিক ইত্যাদি যত প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে—ছাত্রাবস্থায় প্রত্যেকটীরই সাধনা হইলে শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে।

যাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনের অভাব মোচন করিতে পারা যায় এরূপ শিক্ষা লাভ হইলে ছাত্র ও অভিভাবকগণ প্রথম হইতেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়। তাহা না হইলে "এখন লেখাপড়া আরম্ভ ত করা যাক্" এই ভাবিয়া লক্ষ্যহীনভাবে বিদ্যারম্ভ করা হয়, এবং অন্যের অভিপ্রায় মত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরে দেখা যায় যে—না হইল শিক্ষালাভ, না হইল স্বার্থসিদ্ধি।

কিন্তু প্রথম হইতেই ছাত্রের আদর্শ স্থির করিয়া দিলে ভবিষ্যতে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িতে হয় না। পরীক্ষার ফলাফলে জীবন সার্থক বা নিষ্ফল মনে হয় না। দুটা একটা 'পাশে' বেশী যায় আসে না। কারণ তখন জানা থাকে যে, যাই ফল হ'ক না, সাধ্য অনুসারে চেষ্টা ত করা গিয়াছে, এখন শক্তি থাক বা না থাক জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

শিক্ষালয়ের শাসন

শিক্ষালয় স্থানীয় সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত। সকলেরই পরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণের হস্তে ইহার পরিচালনা ও শাসনভার ন্যস্ত থাকা সঙ্গত। তাহা হইলে সকলেই ইহার উন্নতিবিধানে যত্ন করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন। সকল বিষয়েই অভিভাবকগণ, জনসাধারণ এবং শিক্ষকেরা সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। এই উপায়ে ইহার ভবিষ্যতের জন্য সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

পরিচালনা-সমিতি

বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ, আয়ব্যয়, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েই কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকগণের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে পরস্পর পরস্পরের অনুকূল ও সহায় হইতে পারেন। ফলতঃ বিদ্যালয় সুশাসিত এবং ছাত্রগণ সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

প্রাচীন কালে গুরু-গৃহে ছাত্র ও শিক্ষকদিগের একত্র বাসের ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে যদি সে ব্যবস্থা করা কঠিন হয়, তাহা হইলে ছাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক বিষয়ে অভিভাবকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য ছাত্রগণের গৃহের চরিত্র ও পাঠাভ্যাস এবং জনসমাজ ও গুরুজনের প্রতি আচরণাদি সম্বন্ধে অভিভাবকদিগের হস্তে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। এ সকল বিষয়ে শিক্ষকদিগের শাসন অথবা বিদ্যালয়ের বিধান বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে না।

শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্বন্ধ

আজকালকার "রেসিডেন্শ্যাল" বিদ্যালয়গুলি প্রাচীন গুরু-'কুলে'র অনুরূপ নয়। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে বাস করে মাত্র। তবে এইরূপ শিক্ষার্থিগণের মোটামোটি জীবন যাপন সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

সাধারণতঃ ছাত্রদিগের চরিত্র ও শাসন সম্বন্ধে অভিভাবকগণের নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করা উচিত—

(ক) তত্ত্বাবধানস্থ কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার সময়ে অভিভাবককে স্বহস্তে লিখিত অনুমতি-পত্র প্রদান করিতে হইবে

এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র পূর্ব্বে কোন বিদ্যালয়ে পড়িত কি না,—পড়িলে সেই বিদ্যালয়ের বেতনাদি সমস্ত প্রাপ্য দেওয়া হইয়াছে কি না, এবং সেই বিদ্যালয়ে তাহার কিরূপ আচরণ ছিল ইত্যাদি বিষয়ের সার্টিফিকেট প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(খ) বিদ্যালয়ের অবকাশকালে ছাত্রেরা গৃহে কিরূপ আচরণ করে, অবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার সময়ে অভিভাবকদিগের তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

(গ) যদি স্থানীয় লোকহিতকর কোন কার্য্যে ছাত্রদিগের যোগদান করিতে হয়, অথবা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে কোন কার্য্য করিবার জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়, অথবা তাহারা গ্রামান্তরে যাইয়া শিক্ষাপ্রচার বা অর্থসংগ্রহ করিতে অভ্যাস করে তাহা হইলে অভিভাবকগণের অনুমতি গ্রহণ কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য।

(ঘ) প্রতিমাসে অভিভাবকগণের নিকট ছাত্রদিগের দৈনিক পরীক্ষার ফল-বিজ্ঞাপনপত্র প্রেরিত হয়। তাঁহাদের সেই ফল-বিজ্ঞাপনপত্রে গৃহের চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

অধ্যাপক

অধ্যাপকগণের একাধারে অনেক গুণ থাকা আবশ্যক। কেবল মাত্র পাঁচ ঘণ্টা স্কুলে কয়েকটী বইএর অর্থ করিয়া ছাত্রগণকে মুখস্থ করাইয়া দিতে পারিলেই অধ্যাপকদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না।

অধ্যাপকের গুণ
(১) শিক্ষক

ইঁহাদিগকে প্রথমতঃ ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি বিশেষ কোন এক জ্ঞানানুশীলনে রত থাকিতে হইবে। প্রকৃত 'বিশেষজ্ঞ' বা পণ্ডিতভাবে সত্য আবিষ্কারের জন্য বিদ্যাচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করা অধ্যাপকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অপর দিকে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরিচালনাবিষয়ক সকল প্রকার কর্ম্ম, ছাত্রগণের চরিত্র-গঠন, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা-আনয়ন, সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রভৃতি বিবিধ পরিচালনা-কার্য্য করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত।

(২) বিশেষজ্ঞ

(৩) ধুরন্ধর

অধিকন্তু, শিক্ষার্থীর বয়স ও প্রবৃত্তির বিকাশানুসারে কখন কোন্ বিদ্যা আলোচিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত, তাহাকে কোন্ কোন্ বিষয় এবং কত বয়সে কোন্ বিষয়ের কত অংশ শিক্ষা দেওয়া উচিত—এই সমুদয় শিক্ষাবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করা অধ্যাপকগণের কর্ত্তব্য। তাহার জন্য সকল শাস্ত্র এবং সকল বিদ্যার প্রতি অনুরাগী থাকিয়া অধ্যাপকদিগকে প্রকৃত "এডুকেশনিষ্ট" বা শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞের মর্য্যাদা লাভ করিতে হইবে।

(৪) শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ

আবার, পুস্তকের সাহায্য না লইয়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। সুতরাং বিবিধ পুস্তকাদির সারসংগ্রহ করিয়া স্বাধীনভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের পাঠ প্রস্তুত করা শিক্ষকদিগের একান্ত আবশ্যক। সেই সকল বিষয়

(৫) গ্রন্থকার

শৃঙ্খলীকৃত করিয়া পুস্তকাকারে লিখিতে চেষ্টা করিলে ইহাঁদের চিন্তাশক্তির পরীক্ষাও হইতে থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত, যাঁহারা বিদ্যাদানই ধর্ম্ম মনে করিতে শিখেন নাই, এবং যাঁহারা শিক্ষাবিস্তার-কার্য্য জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের দ্বারা শিক্ষাবিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা-ব্রতধারী শিক্ষক অতি বিরল।

ছাত্র-শিক্ষক

এই সকল কারণে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের কার্য্যোপযোগী শিক্ষক তৈয়ারী করিয়া লইবার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

অধ্যাপকগণের শিক্ষা

এই উদ্দেশ্যে যে সকল ছাত্রেরা শিক্ষালয়ের উন্নত শ্রেণীতে পড়িতেছে এবং বিদ্যাদান-কার্য্যে যাহাদের প্রকৃত প্রবৃত্তি আছে, এরূপ শিক্ষানুরাগী অধ্যয়নশীল ছাত্রদিগকে অধ্যাগনাকার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভবিষ্যতে সুফললাভ হইতে পারে। এই বিধানে ছাত্র-শিক্ষকের উৎপত্তি হইবে। অবশ্য সেই ছাত্র-শিক্ষকগণের উচ্চতর শিক্ষার ভার-গ্রহণও বিদ্যালয়ের পরিচালকগণের কর্ত্তব্য। প্রাচীন হিন্দু-সমাজের চিন্তাবীরগণ ও শিক্ষাবিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠাতারা এইরূপে আচার্য্য, অধ্যাপক এবং গুরু তৈয়ারী করিয়া লইতেন। সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন দ্বারা তাঁহারা 'মাষ্টার' সংগ্রহ করিতেন না!

শিক্ষার্থীদের কথঞ্চিৎ মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইবার পর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত যুগপৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কার্য্য সম্পন্ন

যুগপৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার আবশ্যকতা

হইবার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে জ্ঞানানুশীলনে উন্নতি সাধিত হয়। কারণ শিক্ষকতাকার্য্যের দ্বারা ছাত্রের অথবা ছাত্র-শিক্ষকের অনেক লাভ হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি শিক্ষাপদ্ধতিসম্বন্ধীয় বিষয়সমূহে অভিজ্ঞতা জন্মে; স্বাধীনভাবে কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার দায়িত্বগ্রহণে সাহস হয়; এবং ক্রমশঃ নিজ নিজ বিশেষ আলোচ্য বিষয় বাছিয়া লইয়া কেবলমাত্র সেই বিষয়েই সম্পূর্ণ মনোযোগী হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই উপায়ে বিশ্বশক্তির সহিত আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞ হইবার সুযোগও সৃষ্ট হয়।

অধিকন্তু শিক্ষার্থীরা পঠদ্দশায়ই বিদ্যাপ্রয়োগের ক্ষেত্র পাইয়া অশেষ উপকৃত হয়। পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞান অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে, এবং সরস ও বদ্ধমূল হয়। এতদ্ব্যতীত, সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধিত হইতে থাকে; এবং শিক্ষাপ্রচাররূপ লোকহিতকর কার্য্যে যোগদানের ফলে ছাত্র-জীবনেই প্রকৃত নৈতিকচরিত্র-গঠনের সূত্রপাত হয়।

প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে এই প্রণালীতে ছাত্র-শিক্ষক গড়িয়া উঠিত। "ব্রহ্মচারী"রা সকলেই একসঙ্গে শিক্ষার্থী ও অধ্যাপক-জীবন যাপন করিতেন। ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে "সমাবর্ত্তমান" স্নাতকগণ সমাজ-সেবক কর্ম্মকুশল গৃহস্থ হইতে পারিতেন। সকলে গার্হস্থ্যাশ্রমে অতি সহজেই শিক্ষাপ্রচারক ও অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা *

ধর্ম্মশিক্ষার আয়োজনের জন্য আকাঙ্ক্ষা

প্রায় দুই পুরুষ কাল ইংরাজী ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে ভারতবাসী শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। এই শিক্ষা-প্রণালীর একটা অসম্পূর্ণতার দিকেও প্রথম হইতেই সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেটা বিদ্যাচর্চ্চায় ধর্ম্মশিক্ষার অভাব।

দেশীয় লোকেরা অল্পকালের মধ্যেই দেখিলেন, সমাজে ভক্তি ও প্রেমের বন্ধন চলিয়া যাইতেছে, শ্রদ্ধার সম্বন্ধ কমিয়া আসিতেছে। তাহা নিবারণের জন্য ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-গৃহে নীতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইবার আয়োজন হইল, এবং ছাত্রাবাসের মধ্যে দেবালয় ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ রাজপুরুষেরাও ভাবিলেন—'সমাজের এইরূপ নীরব প্রতিবাদসমূহ কি নিতান্তই অমূলক? শিক্ষিত সমাজে রাজদ্বেষের ভাব এবং নরহত্যার প্রবৃত্তির জন্য যে ধর্ম্মহীন শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী নয়, তাহা কে বলিতে পারে?'

ইতিমধ্যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ শিক্ষার আয়োজনে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আর এ জন্য দুইটা নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই সকল কারণে বিদ্যার

---

* চুঁচুড়ার বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত, ফাল্গুন, ১৩১৮

সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে কি না গবর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগও তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া সরকারের অধীনে একটা স্বতন্ত্র 'রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট' বা উচ্চ 'অনুসন্ধান-বিদ্যালয়'-প্রতিষ্ঠারও আয়োজন হইতেছে। সেখানে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় বিশেষরূপ উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হইবে। প্রাচ্য সভ্যতা বুঝিবার জন্য চেষ্টা বিশেষরূপেই হইবে। সুতরাং আশা করা যায়, শীঘ্রই দেশে প্রাচ্য জনগণের অবস্থোপযোগী ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

পাশ্চাত্যের অনুকরণ

কিন্তু এই সঙ্গে আধুনিক ভারতের একটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু আমাদের সমাজের অভাব ও স্বভাবের সঙ্গে প্রায় কোন অনুষ্ঠানেরই যথার্থ সম্বন্ধ থাকে না। অন্যকালে বা অন্যদেশে হয় ত কোন অনুষ্ঠানে সুফল পাওয়া গিয়াছে। ভালরকম চিন্তা না করিয়াই তাহার প্রয়োগ আমাদের সমাজেও চলিতে থাকে।

আধুনিক ভারতের দুর্ভাগ্য

এখানে কোনও আইন চালাইতে হইলে বিদেশ হইতে তাহার নমুনা আনা হয়, বিদেশেই তাহার খসড়া প্রস্তুত হয়। ভারত-বাসীর আর্থিক উন্নতিবিধান করিতে হইবে?—বড় বড় ফ্যাক্‌টারী ও কারখানা তৈয়ারী আরম্ভ হইল, অবাধ-বাণিজ্যনীতি প্রচলিত হইয়া গেল! কারণ, এই সকল উপায়েই হয়তো আমেরিকায় বা

ইংলণ্ডে বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষা দিতে হইবে? অমনি জাতিভেদ ভাঙ্গিবার প্রয়োজন বোধ হইল, অথবা ম্যাজিক-লণ্ঠন কেনা হইতে লাগিল! আর কোন প্রকারেই যেন লোকচরিত্র গঠিত করা যায় না। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে?—ফুটবল—ডাম্বেলে বাজার ভরিয়া গেল। একতা বাড়াইতে হইবে? হিন্দু-মুসলমান ব্রাহ্ম-খৃষ্টান এক টেবিলে খাইতে বসিয়া 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' হইয়া গেলেন! বাস্তবিক, শিক্ষাই হউক, বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারই হউক, সামাজিক আচার-ব্যবহারই হউক বা বৈষয়িক কাজকর্ম্ম হউক—যাহাতে উন্নতির প্রয়োজন, দেখিতেছি তাহাতেই ব্যবস্থা করা হয়—নিজেদের 'ধাত', নিজেদের গতি, নিজেদের অতীতের সম্যক্ আলোচনা না করিয়া।

পাশ্চাত্য কর্ম্মিগণের নেতৃত্ব

এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থার কারণ আছে। আজকাল প্রায় সকল বিষয়েই আমাদের চিন্তা ও কার্য্য এবং উন্নতির প্রবর্ত্তক—আমাদের শাসনকর্ত্তারা। তাঁহাদের অধ্যাপক ও প্রচারকই শিক্ষাব্যাপারে আমাদের নেতা। তাঁহাদের এঞ্জিনীয়ার ও চিকিৎসকই আমাদের আধুনিক বৈষয়িক ও ভৈষজ্য কর্ম্মে আমাদের পথপ্রদর্শক। সুতরাং তাঁহাদের পাশ্চাত্যজগতের অভিজ্ঞতা এবং স্বদেশীয় জাতীয়শিক্ষার অনুষ্ঠান ছাড়া তাঁহাদের নিকট আমরা আর কিছু আশা করিতেই পারি না। আর আমাদের দেশের যাঁহারা তাঁহাদের দৃষ্টান্তে, অধ্যাপনায় ও উৎসাহে কাজ করিতে আরম্ভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বেশী লোক

স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইতে সুযোগ পান নাই। আমরা এখনও অনুকরণের যুগেই আছি, আমাদের বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালী ও স্বাতন্ত্র্যবোধ যথোচিত বিকাশলাভ করে নাই।

বিশেষতঃ আমাদের অনেকেই কার্লাইল, হুইট্‌ম্যান, টলষ্টয় প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাবীরগণের ভাবুকতায় ও অতীন্দ্রিয়তায় মুগ্ধ। তাঁহারা এই আধুনিক আধ্যাত্মিকতার কথঞ্চিৎ সন্ধান পাইয়াই প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মর্ম্মস্থল অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন এইরূপ তাঁহাদের ধারণা। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, আমাদের সভ্যতার মূলমন্ত্র, আমাদের সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্য বুঝিবার জন্য কেহ চেষ্টা করিবার প্রয়োজনই বোধ করেন না। উপনিষদ্ ও গীতার দুই চারিটা শ্লোক মনে রাখিলেই হইল,—আর বৈদান্তিক উপদেশ, আত্মার অমরতা, জীবনের সাধনা প্রভৃতি আলোচনার জন্য ভাবনা কি? রুসো, ব্রাউনিং, এমার্সন, শোপেনহয়ার ঘাঁটিলেই চলিতে পারে!

স্বদেশীয়গণের চিত্ত-সম্মোহন

পাশ্চাত্য-সমাজে ধর্ম্মশিক্ষা

আমাদের চিত্তে স্বাতন্ত্র্যবোধ এতই কমিয়া গিয়াছে যে, আমরা আমাদের চারিদিক্‌কার অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা বিচার করিতে পারি না। আমাদের প্রকৃতির উপযোগী কোন অনুষ্ঠান আবিষ্কার করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব।

শিক্ষার ব্যবস্থায় ধর্ম্মসমস্যার মীমাংসা

ধর্ম্মশিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে? অমনি পাশ্চাত্যসমাজের যুক্তিগুলি মনে পড়িয়া গেল। তাহাদের সমাজে ও ধর্ম্মে যে সকল বিশেষ সমস্যা আছে আমরাও সেই সমস্যাগুলি আমাদের সমাজে টানিয়া আনিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহাদের আশঙ্কাগুলিও আমাদের মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে!

আশঙ্কা

ইউরোপ ও আমেরিকার নেতৃবর্গ মনে করেন—বিদ্যা ও ধর্ম্ম পরস্পরবিরোধী। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিলে বিদ্যার সর্ব্বনাশ করা হয়। আবার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার আধিপত্য প্রবর্ত্তিত হইলে ধর্ম্মভাব জলাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। দুয়ে কখনই মিলিতে পারে না,—বিদ্যা আলোক, ধর্ম্ম অন্ধকার। বিদ্যা যুক্তি ও তর্কের সন্তান, ধর্ম্ম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আশ্রিত। বিদ্যা পৃথিবীর উপর মানুষের অধিকার বাড়াইয়া দেয়, ধর্ম্ম ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করিয়া মানুষের শক্তিকে সংযত ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। বিদ্যায় ভবিষ্যৎকে দখল করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, ধর্ম্মে অতীতের প্রতি মমতা বাড়িতে থাকে। বিদ্যা মুক্তির উপায়, ধর্ম্ম বন্ধনের কারণ। সুতরাং আমরা 'সোণার পাথরবাটী' অথবা 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' বলিলে যেরূপ ধারণা করিতে পারি, পাশ্চাত্যজগতের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থায় সেইরূপই এক অসম্ভব অস্বাভাবিক সংযোগের ভয়ে ত্রস্ত হন।

তাঁহাদের আর এক ভয়ের কথা—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ এবং বিচিত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়। শিক্ষার ব্যবস্থায় ধর্ম্মচর্চ্চার আয়োজন

করিতে হইলে দেশের কোন্ সম্প্রদায়ের, কোন্ মতবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে? দলাদলি, সংগ্রাম ও বিরোধ যে তাহা হইলে সমাজে চিরন্তন হইয়া পড়িবে। পাশ্চাত্যজগতে ধর্ম্মসংগ্রাম, ধর্ম্মনির্য্যাতন, ধর্ম্মকলহের ইতিবৃত্ত পুনরায় অভিনীত হওয়া কখনই শ্রেয়স্কর নয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের আবেষ্টনের মধ্যে ধর্ম্মের কথা তুলিয়া রাষ্ট্রীয় অনৈক্য ও মতভেদগুলি বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই।

এই কুসংস্কার ও অনৈক্য-বৃদ্ধির ভয় আমাদের নেতৃবর্গকেও আক্রমণ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। পাশ্চাত্যজগতে এই সমুদয় মীমাংসা করিবার যে সকল কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে,

মীমাংসা

আমাদের দেশেও তাহারই প্রচলন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটা 'থিয়লজিক্যাল ফ্যাকল্টি' বা ধর্ম্ম-সমিতি গঠন করা হইয়া থাকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে একটা যথাসম্ভব 'রফা' করিয়া কতকগুলি আইন করা হয়। ধর্ম্মশিক্ষা যাহাতে অত্যুচ্চ জ্ঞানবিজ্ঞানের নিয়মেই চলিতে পারে, যাহাতে ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে। জ্ঞানরাজ্যের অন্যান্য বিভাগের তথ্য যে উপায়ে আলোচিত হইয়া থাকে, তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজগতের সত্যগুলিও অনুসন্ধান করিতে বিধান করা হয়। এই উপায়ে বিদ্যায় ও ধর্ম্মে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস চলিতে থাকে। অধিকন্তু, প্রয়োজন হইলে

সম্প্রদায়ভেদে ধর্ম্মমন্দির, ছাত্রাবাস বা পাঠাগারের আয়োজন হয়। আর স্থানে স্থানে মতবাদের প্রাবল্য অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি-সমালোচনা

অবশ্য পাশ্চাত্যসমাজের অভাব-পূরণের উপযোগী বলিয়াই এইরূপ বিচিত্র ধর্ম্মশিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই এক বিধানের দ্বারা পৃথিবীর সকল সমাজেরই অভাব মোচিত হইবে এমন কোন কথা নাই।

মানবজীবনে ধর্ম্মের স্থান সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের ধারণা বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন—ঈশ্বরচিন্তা, ভগবানের আরাধনা, ধর্ম্মকর্ম্ম মানুষের বিশেষ কতকগুলি কার্য্য,—অন্যান্য কর্ম্ম ও চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানুষের মস্তিষ্কে ধর্ম্মচিন্তার জন্য একটা বিশেষ প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার হৃদয়ে একটা বিশেষ বৃত্তি আছে, তাহার চিত্তে এজন্য একটা স্বতন্ত্র আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা আছে। ধর্ম্ম অনেক কাজের এক কাজ মাত্র—জীবনের বিচিত্র বিভাগের মধ্যে একটী বিভাগ মাত্র। মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া শারীরিক আনন্দ উপভোগ করিল, অথবা বিদ্যালয়ে যাইয়া পদার্থবিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনিল, কিম্বা সাহিত্যসভায় আসিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিল, অথবা রাষ্ট্রসভায় আলোচনা করিয়া দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিল, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মকর্ম্ম করা হয় না। তাঁহাদের বিবেচনায় ইহাতে মানুষের শারীরিক বৃত্তির, মানসিক শক্তির অথবা সামাজিক প্রবৃত্তিসমূহেরই অনুশীলন ও পুষ্টি হইল মাত্র।

ধর্ম্ম মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগের একটি বিভাগমাত্র

তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্মের জন্য মানবকে অন্য কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। এ জন্য তাহার কতকগুলি মতবাদ গ্রহণ করা আবশ্যক। ধর্ম্মের বিষয়ীভূত বিশিষ্ট কয়েকটি শাস্ত্র আলোচনা আবশ্যক। ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য বিশেষ কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। ঠিক যখন সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পড়া হয়, অথবা নির্দ্দিষ্ট দিনে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা শুনা হয়, অথবা ধর্ম্মবিষয়ক সমালোচনায় যোগদান করা হয়, কেবল তখনই মানুষের ধর্ম্মাচরণ করা হইল, এইরূপই তাঁহাদের ধারণা। সুতরাং সেই দিনে সেই সময়ে সেই গৃহে যাহা করা হয় হউক, তাহার সঙ্গে দিবসের অন্যান্য চিন্তা ও কর্ম্মের, জীবনের অন্যান্য বিভাগের কোনরূপ সংস্রব নাই। তাঁহারা বিবেচনা করেন, গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির মধ্যে ধর্ম্মকে একটা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দিলেই চলে, কিন্তু সমগ্র গার্হস্থ্যজীবনে, পারিবারিক কার্য্যকলাপে, সৌজন্যশিষ্টাচারে, শিল্প ও ব্যবসায়ে, এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নীতিশাস্ত্র—অর্থনীতি, পরিবারনীতি, রাষ্ট্রনীতি—মানিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই সকল কার্য্য ও চিন্তার ক্রমান্বয় ও পৌর্ব্বাপৌর্য্য স্থির করিবার জন্য ধর্ম্ম আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আর, বাস্তবিক ধর্ম্মশিক্ষায় তাঁহারা কতকগুলি আলোচনা, গবেষণা, গ্রন্থপাঠ, সাহিত্যচর্চ্চা মাত্র বুঝেন। থিয়লজিক্যাল ফ্যাকলটির বিধানে শিক্ষার্থিগণকে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারকদিগের

জীবনী সংগ্রহ করিতে হয়। কোন্ কোন্ মহাত্মা তাঁহাদের ধর্ম্ম-ইতিহাসের স্তম্ভস্বরূপ, কবে কোথায় কিরূপভাবে কোন এক মতবাদ বা অনুষ্ঠান বিকাশ লাভ করিয়াছে, কোন্ মহাপুরুষ কি উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে মাত্র।

ধর্ম্মশিক্ষা ইতিহাস-শিক্ষার এক অধ্যায়

ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠকে ধর্ম্মজীবনগঠনের উপায় বিবেচনা করিলে ধর্ম্মের ইতিবৃত্তসঙ্কলনই ধর্ম্মকর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই আলোচনায় জাতীয় ইতিহাস অনেকটা স্পষ্ট ও বিশদ হয়, এবং ইতিহাস-শিক্ষা কার্য্যকরী ও সুখদায়ক হইতে পারে। ইহাতে দেশীয় ধর্ম্মের পৌর্ব্বাপৌর্য্য এবং জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিচিত্র অঙ্গগুলি হৃদয়ের উপর বেশ প্রবলভাবে অধিকার লাভ করিতে থাকে। জাতীয়-শিক্ষার সার্থকতার পক্ষে ইহা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে সমাজের ও দেশের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি শিক্ষার্থী অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

এইরূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থ-পাঠে আরও একটা লাভ আছে। দেশের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ প্রণালীতে চিন্তা করিতেন, তাঁহাদের আচার্য্যেরা বিশ্ব, দেবতা, পূজা, মানবের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন্ কোন্ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য কি উপায়ে সাধিত হইয়াছে, সেই মতবাদসমূহ সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কি না, জাতীয়

ধর্ম্ম-শিক্ষা দর্শন-শিক্ষার এক অঙ্গ

জীবনের অন্যান্য বিভাগের চিন্তা ও কর্ম্মসমূহ কি ভাবে তাহার ফলে রূপান্তরিত হইয়াছে—ইত্যাদি দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিষয়ক বিবিধ প্রশ্নের আলোচনা করিবার সুযোগ ও থাকে। এই উপায়ে দেশের পূর্ব্বাপর চিন্তাসমূহ ছাত্রের মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। তাহাতে দেশকে চিনিবার পক্ষে, সমাজের প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে ছাত্রাবস্থায়ই সুবিধা পাওয়া যায়।

তাহা ছাড়া দর্শন ও মনস্তত্ত্বের আর এক বিভাগও এই উপায়ে আয়ত্ত হইয়া আসে। বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা 'ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে'র নিয়মগুলি ধরিতে পারা যায়। মানবের আদিম ধর্ম্মভাব, মানুষের চিরন্তন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং বিচিত্র ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে কি সাধারণ লক্ষণ আছে, তাহা এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান আলোচনার মধ্য দিয়াই স্পষ্ট হইতে থাকে।

ধর্ম্মবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ

যাহা হউক, এই প্রকার ধর্ম্ম-শিক্ষার আয়োজনে গণিত, সাহিত্য, রসায়ন প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ধর্ম্ম একটি বিদ্যা মাত্র। ইহাতে ধর্ম্মশিক্ষা ইতিহাস-শিক্ষারই বিশেষ এক অধ্যায়রূপে অথবা দর্শনশিক্ষার এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ভাবে শিক্ষাপদ্ধতিতে মর্য্যাদা লাভ করে,। ধর্ম্ম বিশেষ একটি শিক্ষণীয় বিষয় মাত্ররূপে বিবেচিত হয়। কাজেই গণিতের 'ফ্যাকলটি', ইতিহাসের ফ্যাকলটি, চিত্রবিদ্যার ফ্যাকলটির ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ধর্ম্মালোচনার এক ফ্যাকলটি বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেই যথেষ্ট হয়। এই ধর্ম্ম-সমিতি বিবিধ উপদেশ-

সংগ্রহ, ধর্ম্মতত্ত্ব-সঙ্কলন, ধর্ম্ম-গ্রন্থ-নির্ব্বাচন, ধর্ম্মচর্চ্চা-প্রণালী, ধর্ম্ম-শিক্ষার সময়-নির্দ্দেশ, ধর্ম্ম-শিক্ষক-নিয়োগ প্রভৃতি যাবতীয় উপায়ে বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকেন। গণিত, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদিগকে মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা করা হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়েও এইরূপ পরীক্ষা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের মধ্যেই বিজ্ঞানালোচনার জন্য ল্যাবরেটরী আছে, শিল্পশিক্ষার জন্য ওয়ার্কসপ কারখানা আছে, পাঠের জন্য লাইব্রেরী, গ্রন্থশালা, রীডিংরুম আছে। ধর্ম্মের জন্যও সেইরূপ 'ডিভিনটি'-গৃহ, ধর্ম্মালোচনার মন্দির ও ডিভিনিটি-বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করা হয়। পরীক্ষার ফলে, এম্, এ, পি, এইচ্ ডি, প্রভৃতির অনুরূপ, বি, ডি, ডি, ডি, উপাধি পাওয়া যায়। ধর্ম্মের এই 'ডি-ডি'গণ বক্তৃতা করিবার শিক্ষা পান, প্রবন্ধ লিখিবার শক্তি লাভ করেন, তর্ক-যুক্তি দ্বারা স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, কি উপায়ে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হয় তাহা শিখিয়া থাকেন, লোকের সঙ্গে, ছাত্রের সঙ্গে, বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিলে সুফল লাভ হয় ও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে তাহার বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

ধর্ম্মশিক্ষায় মানসিক উন্নতি-সাধন

এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য ধর্ম্মশিক্ষা-পদ্ধতিতে আর একটা উপকার হয়। ছাত্র ও শিক্ষকেরা অনেকগুলি নূতন ক্ষেত্রে একত্র মিলিতে পারেন, ইহাতে তাঁহাদের সামাজিকতা ও লৌকিকতা বাড়িতে পায়, সমবেত চিন্তা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি পুষ্ট হইতে থাকে,

পরস্পরকে সহায়তা করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু যাহাই হউক, এই শিক্ষা-প্রণালীতে ধর্ম্মশিক্ষা মানসিক শিক্ষারই একটি বিশেষ অঙ্গমাত্র। অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় ধর্ম্ম-শিক্ষায়ও মস্তিস্কেরই সঞ্চালন হয়, চিন্তা করিবারই ক্ষমতা বিকশিত হয়, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্য হয়, আর সামাজিক জীবনের পুষ্টি হয়। সেক্‌সপীয়র ও কালিদাসের কাব্য সমালোচনা করিয়া, মনুসংহিতা বা প্লেটোনীতি পাঠ করিয়া, 'পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ প্রোগ্রেস' বা হিতোপদেশের ব্যাখ্যা মুখস্থ করিয়াও ছাত্রগণ এই সকল বৃত্তিরই বিকাশ সাধন করে, এই সমুদয় শক্তিরই অনুশীলন করে, এই সমুদয় যোগ্যতা ও সামর্থ্য লাভ করে।

ধর্ম্মতত্ত্ব—পাশ্চাত্য ও হিন্দু

জার্ম্মাণি, আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের থিয়লজিক্যাল ফ্যাকল্টি বা ধর্ম্মশিক্ষা-দানের অন্যান্য উপায়গুলি আলোচনা করিলে আর একটা বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথাটা ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

তাঁহারা মানুষকে অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ ভাবে দেখেন। মানুষকে বড় ভাবে, মহৎ ভাবে দেখিবার প্রয়াস তাঁহাদের মধ্যে থাকে না। ইহজগৎই মানুষের সমগ্র লীলা-ভূমি ও কর্ম্মক্ষেত্র, এই জন্মেই তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ। এই গণ্ডীর মধ্যেই তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহার অতীত,

পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব

বর্ত্তমান-ব্যতিরিক্ত, শরীর-ছাড়া এবং মন-ছাড়া আর কোন জগতের অস্তিত্ব নাই। আত্মা তাঁহাদের নিকট মস্তিষ্কের একটা অলীক ধারণামাত্র। অসীমের উপলব্ধি, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বিষয় তাঁহাদের নিকট ভাষার একটা অলঙ্কার বা উপমামাত্র। এই খানেই মানুষের শেষ, এই জীবনেই তাহার চরম সিদ্ধি।

কিন্তু সমাজের মধ্যে থাকিতে হইলে সকল বিষয়েই প্রতিদিন দ্বন্দ্ব, বিরোধ, কলহ, অনৈক্য আসিয়া জুটে। তাহা নিবারণ না করিতে পারিলে সংসারের সুখ কোথায়? পৃথিবী যে দৈনিক সংগ্রামের রঙ্গভূমি হইয়া পড়িবে! কাজেই জনগণের শারীরিক ও মানসিক অনৈক্যগুলি যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টাই পাশ্চাত্য সমাজের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা ভাষা ছাঁটিয়া, বেশভূষার আইন করিয়া, চালচলনের রীতি বিধিবদ্ধ করিয়া, দলে দলে চুক্তি করাইয়া যথা-সম্ভব বৈচিত্র্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টিত হন। জীবনের কোন্ কোন্ বিভাগের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব হইবার সম্ভাবনা নাই, কোন্ কোন্ অংশ বাদ দিলে জোড়াতালি দিয়া একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে একটা চলনসই সন্ধিপত্র দাঁড় করান যাইতে পারে, এই সব আবিষ্কার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য-সমাজের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে এইরূপে ঘসিয়া মাজিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া ও মাঝামাঝি করিয়া বিরোধ ঘুচাইবার, এবং অনৈক্য দূরীভূত করিবার আয়োজন যথেষ্ট দেখা যায়। রাষ্ট্রসভায়, বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মশালায় তাঁহাদের এই এক লক্ষ্য।

পাশ্চাত্য-জগতের এই বিচিত্র মানবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বই তাঁহাদের বিশিষ্ট শিক্ষাতন্ত্রের মূল। তাঁহারা মানুষকে অতি ক্ষুদ্র ভাবে দেখিয়াছেন, সমাজকে এই সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়াছেন। এইজন্য বিরোধের ভয়ে তাঁহারা এত বিব্রত। এইজন্য জাগতিক একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে তাঁহারা ব্যস্ত থাকেন। এইজন্য যে সকল বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অল্প সেই সকল বিষয়ে তাঁহাদের সাহস বড় কম।

প্রকৃত মানবতত্ত্ব

কিন্তু মানবকে আর একভাবে দেখা যায়। কারণ মানুষ কেবল শরীরীই নহে। অসীম অনন্ত তাহাকে ঘিরিয়া আছে। দুই অনাদ্যন্ত জগতের মধ্যে তাহার অবস্থান। আর তাহার আত্মা তাহাকে অসীমেরই এক আত্মীয় করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং কেবল মাত্র সসীমের কথা ভাবিলে, কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয় জানিলে, কেবল সংসার ও ভোগের জ্ঞান জন্মিলে সমগ্র মানবকে জানা হইল না। অতীন্দ্রিয়কে বাদ দিলে, অমরতাকে প্রত্যাখ্যান করিলে মানুষের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কাজেই সমগ্র, সম্পূর্ণ মানবের চরম সিদ্ধি এই এক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হইতে পারে না। কত শত যুগযুগান্তর লইয়া তাহার লীলা, কত শত জন্মমরণে তাহার আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশ, তাহার হিসাব কে রাখিতে পারে? ফলতঃ ইহজগতের বিরোধ, অসম্পূর্ণতা ও ক্ষুদ্রত্বই মানুষকে প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে না। বৃহত্তর পূর্ণতা ও সমগ্রতার মধ্যে অসংখ্য পার্থিব সঙ্কীর্ণতাগুলির

যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাতে সাময়িক অসম্পূর্ণতায়ও প্রকৃত সামঞ্জস্যের এবং সৌষ্ঠবের হানি হয় না।

এই বৃহত্তর সমগ্রতার সংবাদ আনিয়া দেয়—ধর্ম্ম জ্ঞান। মানবের চরম 'স্বারাজ্য' সিদ্ধি এবং আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশের উপায় আবিষ্কার করিয়া দেয়—ধর্ম্ম। এই উদ্দেশ্যে প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মরাশির মধ্যে ধর্ম্ম অসীমকে, যুগযুগান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অনন্তোপলব্ধিই জীবনের প্রকৃত সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য বিধান করে। তাহার ফলে পার্থিবজীবনের সকল বিভাগই, সংসারের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই, ভোগের সকল অনুষ্ঠানই সেই বৃহত্তর সত্তা, সেই অতীন্দ্রিয়-জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম্ম এই উপায়ে সসীমে অসীমের প্রতিষ্ঠা করে, ভোগে ত্যাগের প্রবর্ত্তন করে, জন্মে ও মরণে অমৃতের প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

ধর্ম্ম সকল কর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে, মর-জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল বিষয়েই অমরতার প্রবর্ত্তন করে। সুতরাং ধর্ম্ম কখনও মানবের কোন অনুষ্ঠানকেই বর্জ্জন করিতে পারে না। এ জন্য মানবের কোন কর্ম্মই ধর্ম্ম-ব্যতিরিক্ত হইতে পারে না। জীবনের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই ধর্ম্মনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, সমগ্র জীবনই ধর্ম্মের ক্ষেত্র হইতে পারে। মানুষ শরীরের সাহায্যে যাহা কিছু করে, যত কিছু চিন্তা করে, সকলই ধর্ম্মজীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হইতে পারে। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু করা যায় তাহাও ধর্ম্মেরই বিবিধ অনুষ্ঠান হইতে পারে। এই

সমুদয় কর্ম্ম ও চিন্তার ফলে সংসার পুষ্ট হয়, পরিবার গঠিত হয়, দেবতত্ত্ব সৃষ্ট হয়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় ও শিল্পের বিকাশ হয়। সুতরাং বৈষয়িক জীবন ও রাষ্ট্রীয়জীবন, পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন—সকলকেই ধর্ম্মজীবনের বিবিধ অভিব্যক্তিমাত্র রূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ বা দেবারাধনাই, মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করাই ধার্ম্মিকের সাধনা নহে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দান, উপাসনা, পূজা, আলোচনা, ভ্রমণ, ব্যায়াম ও আচার-ব্যবহার সকলই ধর্ম্মের সাধন। ধর্ম্মজীবনের পক্ষে কোন কর্ম্ম ও চিন্তাই অবজ্ঞেয় নহে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

প্রকৃত ধার্ম্মিক জীবনের সকল অনুষ্ঠানকেই অতি-প্রাকৃত ও অতি-মানবীয় ভাবের দ্বারা সুন্দর, মহৎ ও অমর করিয়া তুলিতে পারেন। তিনি তাঁহার নৈসর্গিক ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে, শারীরিক বন্ধনসমূহের মধ্যে, ইন্দ্রিয়গত চিন্তা ও কর্ম্মসমূহের মধ্যে মুক্তি ও অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রভাব উপলব্ধি করেন। তিনি ভোগকে ও সংসারকে বর্জ্জন করেন না, ইহাকে ত্যাগের দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত শৃঙ্খলীকৃত করেন। তিনি প্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধন করেন না—সন্ন্যাসের দ্বারা শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। বাহ্য আচার তাঁহার উপেক্ষার বস্তু নহে, রূপকল্পনা তাঁহার অনন্তোপলব্ধির প্রতিবন্ধক নহে। তিনি এই সমুদয় স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়াই

প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের বিচিত্র সাধন

অসীম অনন্তের পথে অগ্রসর হন। এইরূপে তাঁহার জীবনের সকল কাজেই অনন্তমুখীনতা থাকিয়া যায়; জীবনের সকল অবস্থায়ই, সকল স্তরেই সন্ন্যাস ও সংসারের, বাসনা ও নির্ব্বাণের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধিত হইতে থাকে। 'দেহাত্মক বুদ্ধি'র ক্রমিক লোপসাধন তাঁহার সমগ্র কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য দেখা যায়। সমগ্র জীবনে ত্যাগের নিয়ম পালন তাঁহার একমাত্র সাধনা বুঝিতে পারি।

সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ ঘটিতেই পারে না। আয়ুর্ব্বেদই আলোচনা করা যাউক, অথবা নাস্তিকতার সমর্থনই করা হউক, ভৈষজ্য প্রস্তুত করাই হউক অথবা রাসায়নিক পরীক্ষাই করা হউক, দর্শনচর্চ্চাই করা হউক বা দেবতত্ত্বের তথ্য সঙ্কলন করাই হউক, পরমাণুবাদ আবিষ্কার করাই হউক, অথবা সমাজের নেতৃত্বগ্রহণই করা হউক, 'প্রাগ্ম্যাটিজম্' প্রতিষ্ঠা করাই হউক, বা কোন কর্ম্মকেন্দ্রের সৃষ্টি ও পরিচালনা করাই হউক,— প্রকৃত ধার্ম্মিকের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই অনন্তমুখী, সকলই এই ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের সাধনা, মুক্তির ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত, সকলই ধর্ম্মশাসনে সুনিয়ন্ত্রিত। কাজেই ধর্ম্ম কোন চিন্তা বা কর্ম্মেরই প্রতিবন্ধক নহে, কোন বিদ্যারই প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, কোন বিজ্ঞানেরই বিরোধী নহে।

ধর্ম্মজীবনের সাধনা

অতএব ধর্ম্মশিক্ষার জন্য মানবের সমগ্র জীবনের হিসাব

রাখিতে হইবে। ভাবিতে হইবে—কি উপায়ে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখকে পরমার্থের অধীন করিতে পারে, শরীরকে আত্মার আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার নৈসর্গিক ভোগপ্রবৃত্তিকে ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা শুদ্ধ, পবিত্র ও সংযত করিতে পারে, তাহার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে, সসীম ধারণাশক্তিকে, সঙ্কীর্ণ অনুষ্ঠানগুলিকে অতি-প্রাকৃত ও অসীম ভাবুকতা এবং উদারতার দ্বারা পূর্ণ, পুষ্ট, সবল ও সজীব করিয়া তুলিতে পারে। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য।

প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্য

কিন্তু মানুষ একেবারেই চরমের ধারণা করিতে পারে না, অসীমের উপলব্ধি করিতে পারে না, সূক্ষ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহার সর্ব্ববিধ ক্ষমতারই সীমা আছে, এ জন্য সকল বিষয়েই সে পঙ্গু। এই কারণে তাহাকে স্থূল সত্য, খণ্ডসত্য, আংশিক তথ্য সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। জীবনের সকল বিভাগেই মানুষ একপ্রকার 'আরোহ-পদ্ধতি' অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকে।

উদ্ভিদ্‌সমূহের সাধারণ নিয়মগুলি প্রথমেই শিক্ষার্থীর আয়ত্ত হয় না। জড়জগতের পরিবর্ত্তনসমূহের মধ্যে যে কি সত্য নিহিত আছে, তাহা সে প্রথম প্রয়াসেই উদ্ধার করিতে পারে না। ধর্ম্মজীবনের সমগ্র সত্যও সেইরূপ কোন মানবই প্রথম উদ্যমে অধিকার করিতে পারে না। তাহাকে অন্ধের মত, নিঃসহায়ভাবে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র পথের ভিতর দিয়া চলিতে হইবে।

আরোহপদ্ধতির ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী

প্রথমতঃ, দেহকে যত উপায়ে সম্ভব বশীভূত করিতে হইবে। শরীরই যখন সকল প্রকার কর্ম্মের ভিত্তি, তখন নানাবিধ সংযমের উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের শাসন দ্বারা ইহাকে নিয়মিত ও শান্ত করিতে হইবে। এ জন্য দৈহিক বৃত্তিসমূহ নিরোধ করিবার বিচিত্র কর্ম্ম অভ্যাসের ব্যবস্থা দ্বারা চিত্তের স্থিরতা, ধীরতা ও তিতিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা হইলেই শারীরিক ও বৈষয়িক ভিত্তি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার, ত্যাগমুখীনতার ও অতীন্দ্রিয়তার অনুকূল হইতে পারিবে।

সংযম

দ্বিতীয়তঃ, নানা উপায়ে পরোপকার ও লোকহিতের বাসনা হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দিতে হইবে। ত্যাগ ও সেবার বিচিত্র কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে হৃদয় হইতে স্বাভাবিক রূপেই অহঙ্কারের লোপ সাধিত হইবে। এই উপায়ে তাহার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া গেলে জগতের পরম সত্যের উপলব্ধি করিবার পক্ষে মানব যোগ্যতা লাভ করিবে। সেই অবস্থায় অতিমানবীয় ও অতি-প্রাকৃত জীবনের ঘটনাগুলি সে বুঝিতে পারিবে, সর্ব্বদা অসীম ও অনন্তের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অমৃতের ও মুক্তির ভূমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।

সমাজ-সেবা

সুতরাং বলা বাহুল্য কোন প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান উপকরণ নহে। মহাপুরুষগণের জীবন-আলোচনা, ধর্ম্ম-ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিবৃতি অথবা ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ

ধর্ম্মশিক্ষার মুখ্য উপায় নহে। এতদ্ব্যতীত নানা লোকে মিলিয়া কোনও এক ব্যক্তিকে গড়িয়া তোলা যায় না। কোন ব্যক্তির চরিত্র গঠন করিবার জন্য হৃদয়ের যে সম্বন্ধ প্রয়োজন, ভক্তি ও স্নেহের যে বন্ধন আবশ্যক তাহা কেবল ব্যক্তিগত আদানপ্রদানেই সংঘটিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া কোন ঐক্যবদ্ধ আইনকানুন এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না। কারণ সাধারণ কোন নিয়ম দ্বারা সকল লোকের উপযোগী বিধি নির্দ্দেশ করিয়া কোন ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন গঠন করা যায় না। চরমে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বারাজ্যসিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধন অবলম্বন আবশ্যক। তাহা কোনও ধর্ম্মসমিতির অনুশাসনে সিদ্ধ হইতে পারে না। আর এই জন্য আধুনিক নিয়মে পরিচালিত কোনও বিদ্যালয়েই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না।

ধর্ম্মশিক্ষার উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা

পাশ্চাত্য দেশে যাহাকে 'ডে-স্কুল' বলে আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। আর এক প্রকার বিদ্যালয় আমাদের দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহাকে সেই সকল দেশে 'বোর্ডিংস্কুল' বলে। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষক সর্ব্বদা এক সঙ্গে বাস করে। আমাদের এখানে 'রেসিডেন্‌শ্যাল' প্রথা নামে ইহা অভিহিত। এই দুই প্রথার বিরুদ্ধেই ইহাদের জন্মস্থানে যুক্তিও আছে। সে যাহাই হউক, ইহাদের কোনটিই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার অনুকূল নহে। দ্বিতীয় প্রথায় শিক্ষার্থী সামাজিকতা কথঞ্চিৎ শিক্ষা করে বটে। কিন্তু

ইহাতেও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিচিত্র ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশ ও পুষ্টি-সাধনের ব্যবস্থা হইতে পারে না।

গুরুগৃহে জীবন-যাপন

ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের মর্য্যাদা রক্ষিত না হইলে আত্মার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না—ধর্ম্মজীবন গঠিত হইতে পারে না। তাহার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রচারের আয়োজন করা আবশ্যক। শিক্ষার্থীর প্রতিদিনকার প্রত্যেক কর্ম্ম ও চিন্তা তাহার শিক্ষকের চিত্তে স্থায়িরূপে প্রবেশ করা চাই। ইহা হৃদয়ের জিনিষ আত্মীয়তার কথা—আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের ফল। এই কাজ আফিসী কেরাণীর রিপোর্টে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। মুদ্রিত ফল-বিজ্ঞাপনপত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সমবেত হইয়া তাহাদের সমগ্র জীবনের কর্ত্তব্য শিক্ষার জন্য তাঁহার উপদেশের প্রার্থী হয়, যদি কোন ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে উৎসবে, রোগে, পারিবারিক কার্য্যকলাপে, সেবায়, শুশ্রূষায় সঙ্গী, সহায়, সেবক ও ভৃত্য ভাবে পরীক্ষা করিতে এবং তাহার প্রবৃত্তিসমূহ নিয়মিত করিতে সুযোগ পান, যদি তাহার সম্পূর্ণ সাধনার জন্য সেই ব্যক্তি একাকী দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলেই এরূপ অন্তর্মুখী, বৈরাগ্যমূলক ধর্ম্মজীবন গঠনের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এই প্রথাকে 'ডোমেষ্টিক' বা গুরুগৃহবাসরীতি বলা যাইতে পারে।

গুরু-গৃহ

অতএব যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে হয় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির আমুল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, অথবা ধর্ম্মশিক্ষার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়কে কেবল মাত্র পরীক্ষামন্দির না রাখিয়া প্রকৃত শিক্ষামন্দিরে, 'টীচিং ইউনি-ভার্সিটি'তে পরিণত করিলে জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে, ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হইবে না। শিক্ষক ও ছাত্রের একত্রবাসের ব্যবস্থা করিলে একটুকু লৌকিকতা ও সৌজন্যশিষ্টাচার এবং সামাজিকতার শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু কেবল তাহার দ্বারাই জীবনের সাধনা খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটিবে না।

শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক

নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-সৃষ্টির দিনে আমি যে অপরূপ প্রস্তাবের উত্থাপন করিতেছি, তাহাতে অনেকেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। যে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষ গড়িবার জন্য বড় বড় বিদ্যার 'ফ্যাক্টরী' খুলিবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে, শিক্ষার বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া এক সঙ্গে বহু ফল-প্রসবের ব্যবস্থা চলিতেছে, সেই উন্মাদনার যুগে পরিবারবদ্ধ শিক্ষানীতি গৃহ-গত বিদ্যাদানরীতি এবং কুটির-শিক্ষালয়ের প্রস্তাব উপেক্ষিত হইবারই সম্ভাবনা। সহজেই প্রশ্ন উঠিবে—গুরুগৃহে কতটুকুই বা শিক্ষা হইতে পারে? কয়জনই বা শিখিতে পারে, কয়টা বিষয়ই বা শিখান যাইতে পারে? গুরু-শিষ্যে হৃদয়গত সম্বন্ধ না হয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু সমগ্রদেশের

শিক্ষার ভার কি ইহার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারে? ইহাতে যে ঘোর অনৈক্য ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিবে! বিভিন্ন গুরুগৃহের পাঠ-চর্চ্চা ও পরীক্ষা-প্রণালীর হিসাব রাখিবে কে? গৃহস্থ হইবার সময় সমাজ শিক্ষার্থীকে সম্মান করিবে বা তাঁহার বিদ্যা ও চরিত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে কি উপায়ে?

শিক্ষাতত্ত্বে প্রাচীন ভারতের আবিষ্কার

এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন ইউরোপ দিতে পারিত না, মধ্য যুগের এবং বর্ত্তমান কালের ইউরোপ এই সমুদয় তত্ত্ব আলোচনা করিতে শিখে নাই। আমেরিকার শিশু সভ্যতা এই শিক্ষাপদ্ধতিকে আদিম মানবসমাজের সরল-সহজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া গায়ে হাত বুলাইবে মাত্র! জগতের ইতিহাসে এই সমুদয় সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে—এক ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ যে বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাতে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ বুঝা যাইত না, অথবা তাহাদের পরস্পর-বিরোধের সামঞ্জস্য করিতে হইত না, তাহাতে ধর্ম্মের জন্য কোন গ্রন্থপাঠ একান্ত আবশ্যক ও একমাত্র উপাদান বোধ হইত না, তাহাতে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবার জন্য দশে পাঁচে মিলিয়া কমিটি গঠন করিতে হইত না, তাহাতে ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষক-সম্মিলন, 'টিচার্সবোর্ড'

এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন নহে

বা ছাত্রাবাস-শাসনসমিতি, হোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রয়োজন হইত না।

শিক্ষাজগতের সেই অপূর্ব্ব আবিষ্কার, ভারতবর্ষের সেই বিশিষ্ট দান দেশ হইতে উঠিয়া গেল কেন? সেই শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা কি ভারতীয় মানবের বিবিধ অভাব দূর হইত না? তাহার সাহায্যে কি ভারত-সমাজের স্বভাবোপযোগী বিধি ব্যবস্থা করা যাইত না?

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা

তাহার নিয়মে কি যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিদ্যার, নূতন নূতন বিজ্ঞানের, নূতন নূতন দর্শনের আলোচনা হইত না? তাহার নিয়মে কি প্রদেশভেদে, ভাষাভেদে, বুদ্ধিশক্তির বিকাশভেদে শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুষ্ঠিত হইত না,—আলোচনা-প্রণালীর বিভিন্নতা সাধিত হইত না? তাহার প্রভাবে কি শিক্ষার্থীরা কেবল বৈরাগী ফকীর হইয়া গুরুকুল হইতে 'সমাবর্ত্তন' করিত? তাহার ফলে কি সংসারের বিচিত্র ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি হইত না—ভোগের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবার জন্য গার্হস্থ্যাশ্রমে বিচিত্র শিল্প ও ব্যবসায় অবলম্বিত হইত না? তাহার দ্বারা কি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সহায়তা করিবার উপযোগী জ্ঞান লাভ হইত না? তাহার বিধানে কি শবচ্ছেদ করা হইত না?—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধীত হইত না?—জড়জগতের তথ্য সংগৃহীত ও আলোচিত হইত না?—রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করা হইত না?

ভারতীয় শিক্ষাবিজ্ঞানের নিয়মে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার সুযোগ না থাকিলে ভারতসমাজে বিভিন্ন জাতি মিশ্রিত ও

অঙ্গীভূত হইয়া গেল কি উপায়ে?—তাহা না হইলে ভারত মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিচিত্র সামাজিক ও ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে শৃঙ্খলীকৃত ও ঐক্যবদ্ধ করিল কি উপায়ে? হিন্দুসমাজের শিক্ষাপ্রণালী এরূপ ব্যাপক, বিস্তৃত এবং বিবর্ত্তনশীল না হইলে ভারতবর্ষে এতগুলি ধর্ম্মবিপ্লব হইল কি উপায়ে? ভারতে সার্ব্বজনীন শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের উপায় না থাকিলে আপামর জনসাধারণ ধর্ম্মের কথা, নীতির উপদেশ, দেবদেবীর আরাধনা, সমাজপ্রতিষ্ঠা, পরিবাররক্ষা, বিষয়-কর্ম্ম শিখিল কি উপায়ে? হিন্দু চিন্তাবীরগণ লোকশিক্ষা সম্বন্ধে অনুৎসাহী থাকিলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন যুগে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া নূতন নূতন ভাষা, নূতন নূতন পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতা, নূতন নূতন দেবতত্ত্ব সৃষ্টি করিল কি উপায়ে? ভারতবর্ষ বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিলে চিকিৎসা, রঞ্জনশিল্প, বয়নকার্য্য, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, মূর্ত্তিগঠন, নৌ-বাণিজ্য, অস্ত্র-শস্ত্রনির্ম্মাণ প্রভৃতি জড়বিজ্ঞানমূলক কাজ-কর্ম্ম কি চলিতে পারিত? শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা ভারতীয় ঐক্য প্রচারিত না হইলে কি মহারাষ্ট্র ও পঞ্চনদ, আন্ধ্র ও বঙ্গদেশের অধিবাসীবৃন্দ বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিয়া, বিভিন্ন সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করিয়া, বিচিত্র রীতিনীতি, বিচিত্র ধর্ম্মকর্ম্ম, বিচিত্র সামাজিক প্রথা অবলম্বন করিয়াও সকলকে এতকাল একই সভ্যতা ও সমাজ-কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনে করিতে পারিত?

যুক্তিকে অবজ্ঞা না করিলে বলিতে হইবে—ভারতবর্ষের

সুধীগণ কালধর্ম্মের অনুসারে শিক্ষাপদ্ধতিকে গুছাইয়া লইতে পারিতেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে বলিতেই হইবে—ভারতবর্ষে যুগে যুগে নব নব অবস্থা-সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া লইতে জানিতেন। তাহারই ফলে ভারত-বর্ষের বিদ্যালয়সমূহ আজকালকার অক্স্‌ফোর্ড, বার্লিন্ এবং আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষালয় হইতে পারিয়াছিল—ভারতবর্ষের পল্লীসমূহ সেই সময়কার চিন্তা-জগতের রাজধানী হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির ফল

তাহারই ফলে ভারতবর্ষের শিল্পব্যবসায় ও কারুকার্য্য স্বদেশের অভাব মোচন করিয়া পৃথিবীতে অন্ন, বিলাস ও সভ্যতা বিতরণ করিতে পারিত। ভারতীয় পল্লীর গুরুগৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটগণ রাষ্ট্র গঠন করিতেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তক হইতেন। তাহারই ফলে তাঁহারা মহাভারতের, এবং ভারতবর্ষের বাহিরে বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়া অশিক্ষিতকে শিক্ষিত, বর্ব্বরকে সৌজন্যবান, অসভ্যকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তাঁহারা সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বে পারদর্শী হইয়া লোকের ধারণাশক্তি ও প্রবৃত্তির বিকাশ অনুসারে সমাজে বিচিত্র ধর্ম্মপ্রণালী, বিচিত্র পূজাপদ্ধতি ও বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আমাদের আদর্শ নরপতি—

"জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥"

তাহারই ফলে ভারতীয় প্রদেশসমূহের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নতা অনুসারে তাঁহারা ধর্ম্মবন্ধনের ও সমাজব্যবস্থার বৈচিত্র্য রক্ষা করিতেন। আর এই জন্যই ভারতবর্ষে কখনও প্রতিভা-সম্পন্ন চরিত্রবান্ নরনারীর অভাব হয় নাই। আর্য্যযুগের বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হইতে রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত,—পাণিনি, চরক, চাণক্য হইতে চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত, মৈত্রেয়ীর কাল হইতে অহল্যাবাই, রাণী ভবানী পর্য্যন্ত,—চন্দ্রগুপ্ত হইতে শিবাজী পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য বিচিত্র চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর আবির্ভূত হইয়া ভারতের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন, ভারতবর্ষের সাধনাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়াই অমর, অক্ষয় ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

নব্যভারতের লক্ষ্য ও আদর্শ

আর আধুনিক যুগের মানব-সমাজকে এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই ভারতবর্ষ এখনও বাঁচিয়া আছে। পৃথিবীতে যে সকল দেশে আজকাল প্রাথমিক শিক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে অধিকার ও সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতিও ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। জার্ম্মাণির শিল্প-বিদ্যালয়ে, আমেরিকার কৃষি-কলেজে, এই বিচিত্র বাণীপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষ এখনও তাহার বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। এই শিক্ষাপদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই, কেবল যত্নাভাবে মলিন ও

নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষ তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই নূতন যুগের মানবজাতি অন্যান্য দেশে কয়েকটি বিদ্যা ও শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে—তাহা এই দেশের পক্ষেও সম্পূর্ণ নূতন নহে। ভারতবাসী কোন কালেই বাস্তবজ্ঞানসম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন ছিলেন না। এই বাস্তব-জগতের নূতন নূতন বিদ্যাগুলি ও এই শিক্ষাপদ্ধতি নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া নিজের বিশিষ্ট উপায়ে ভারতবর্ষ তাহার সমাজে প্রচলিত করিবে।

মানবের ভবিষ্যৎ ও আধুনিক ভারত

আমরা নূতন নূতন শিল্পের সন্ধান পাইতেছি; রেলগাড়ী, ষ্টীম-এঞ্জিন, ছাপাখানা, তড়িৎশক্তির প্রভাব দেখিতেছি; স্বায়ত্ত-শাসনের, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু এই সমুদয় আসিয়া ভারতবর্ষকে অভিভূত করিতে পারিবে না—ইহাদের উৎকট ক্ষমতার নিকট ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে না—ভারতবাসী ইহাদের প্রভাবে স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বিশ্বকে দরিদ্র করিবে না। আমরা রেলগাড়ী আয়ত্ত করিব, মুদ্রাযন্ত্র গ্রহণ করিব—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অসাম্য এবং জীবনসংগ্রাম বৃদ্ধি করিবার জন্য নহে, দ্রুতগতিতে সমগ্র পৃথিবীকে ভাবুকতার দ্বারা অভিভূত করিবার জন্য—ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ের সুবিধা-সৃষ্টির জন্য। আমরা শিল্পের উন্নতি বিধান করিব, নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানালোচনায় যত্ন করিব—পার্থিব সুখভোগের দাস হইবার জন্য নহে,—নূতন নূতন নিষ্কাম কর্ম্মের পন্থা আবিষ্কারের জন্য।

আমরা স্বদেশকে ভালবাসিব, জাতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিব—বিরোধ ও বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে, মানব-সমাজের বৈচিত্র্য ও ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। আমরা বিজ্ঞানসম্মত শাসন-প্রণালী অবলম্বন করিব—ইউরোপের অনুকরণে সমাজগঠনের জন্য নহে, পাশ্চাত্য সমাজ-তত্ত্বের 'বুকনি' লাগাইয়া জগৎকে বিজ্ঞান ও প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের অদ্ভুত সমন্বয় বুঝাইবার জন্য।

ভারতবর্ষের বাণী

আমরা দেখাইব যে সাম্য—যথেচ্ছাচার ও অনৈক্যের নামান্তর মাত্র নহে; ভেদবুদ্ধি ও অসাম্য মাত্রই—ঐক্য, সহানুভূতি ও প্রেমের প্রতিবন্ধক নহে। আমরা জগৎকে দেখাইব যে সারা জীবন সংসারের কর্ম্মে ব্যয় করিয়াও যথাসময়ে সকল বাসনা ত্যাগ করা যায়; জড়জগতের তথ্য আলোচনা করিয়াও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা যায়; জড়বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইয়াও বিচিত্র নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আস্তিক্য বুদ্ধি রক্ষা করা যায়; এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে রাষ্ট্রের পরিচালক, সমাজের নায়ক ও বৈষয়িক অনুষ্ঠানসমূহের ধুরন্ধর হইয়াও বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবশেষে যোগাভ্যাস দ্বারা তনুত্যাগ করা যায়।

হিন্দুসমাজ সেই উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়া আছে। জগতে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হইলেই ইউরোপের ভারতে পদার্পণ সার্থক হইবে, কারণ তাহারই পরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যসম্মিলনের প্রকৃত ফল ফলিতে আরম্ভ করিবে। আধুনিক যুগোপযোগী ভারতগঠনের অর্থ

ইউরোপের অনুকরণ নহে—ভারতের স্বকীয় আত্মপ্রকাশ, নিজ বিশেষত্বের আধিপত্য-প্রতিষ্ঠা।

বিশ্ব মানবের হৃদয়মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—যন্ত্র ও উপ-লক্ষ্যের অভাব হইবে না।

সমাপ্ত।

Opinions

1. MAHAMAHOPADHYAYA PANDIT **ADITYA-RAM BHATTACHARYYA,** M. A., Fellow, Allahabad University, Late Professor, Muir College, Allahabad, author of *Riju Vyakarana* :—

"I write this in my appreciation of your effort to facilitate and **popularise the study** of Sanskrit. Your method to teach sanskrit without the learner's going through a first course of grammar merits trial.

The old method has done its part so long and will remain inevitable in the case of higher and thorough study. But if **quicker methods** of acquiring languages, living or dead, be discovered and introduced, humanity will bless him whose inventive genius can succeed to achieve the object which every well-wisher of learning has at heart.

At the very outset the attempt looks somewhat revolutionary. But in other fields it is such **revolutionary departures** from the old track that has hastened the advance of arts and science."

2. RAIBAHADUR BABU **SRISH CHANDRA BASU,** B. A., *of the Provincial Civil Service,* (*U. P.*), author of the *Ashtadhyayi* of *Panini,* (M. A. Text-Book, London University) and Translator (and

annotator) of Bhattaji Dikshita's *Siddhanta Kaumudi*, the *Upanishads, Vedanta Sutra* and the *Mitakshara* in the 'Sacred Books of the Hindus Series' :—

"The scheme of Sanskrit works in Professor Benoy Kumar Sarkar's pedagogic series is based on the conception that any language, whether inflectional or analytical, living or dead, can be learnt exactly in the method in which the mother-tongue is acquired. No preliminary training in the generalisations and definitions of grammar is therefore required, and the student may be at once introduced to the *sentence* as the unit of thought and expression.

By a skilful and systematic application of this method, Professor Sarkar has been able to build up, through lessons and exercises in translation, conversation, questions and answers, and correction of errors, a text-book in Sanskrit which serves the *double purpose* of a guide to composition and a series of primers on Sanskrit literature. From this series of books the reader can master not only the necessary rules of Sanskrit Grammar, but also will be familiar with some of the most **important passages of standard classics**, e. g., *Raghu-vansam, Kumar-sambhavam, Ramayanam* and *Manu Sanhita*, adaptations or originals of which the author has incorporated in his book as

specimens of narrative, historical, poetical and other styles.

In applying to the study of Sanskrit principles and methods that have been utilised in modern languages in Europe, Professor Sarkar has demonstrated, through practical illustrations, lesson by lesson, that the most highly inflectional languages may, with considerable economy of time and labour and other pedagogic advantages, be reduced to the same method of teaching and treatment, as those languages which are not bound hard and fast by Grammar. To all students of Sanskrit language and literature, Professor Sarkar's series cannot but be eminently useful and instructive; and scholars interested in the art of teaching and the history of Sanskrit learning cannot but note the **considerable improvement on the existing Readers and Primers** that are in most cases mere imitations or occasional modifications of the really original works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagara, C. I. E.—whose genius succeeded in simplifying and adapting Panini for the use of students in Bengal.

The method of the Pioneer of Sanskrit learning can no longer be profitably used under the altered conditions of the times; and it is desirable that the new method should have a **fair trial in our secondary schools** in the interest of educational reform."

৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই গ্রন্থ বিশেষ অবধানের সহিতই আলোচনার যোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শিক্ষাব্যবসায়ী তাঁহারা এই বই যত্ন করিয়া পড়িবেন ও উপকারলাভ করিবেন, এইরূপ আশা করি। বিনয়বাবু যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিপুলবিস্তৃত ও দুঃসাধ্য। ইহা সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশের মহৎ উপকার সাধন করুন এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

৪। শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হইলাম। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থের বিপুলতার কথা ভাবিতে গেলে মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, এই প্রকার বিপুল গ্রন্থ এক ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে কি না। কিন্তু পুস্তক-লেখক ভূমিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার ও অধ্যবসায়ের যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণই আশা করা যাইতে পারে যে, তিনি যথাসময়ে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবেক, ও সেই উদ্দেশ্যে, আমার বিবেচনায় কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নয়, ইংরাজী ভাষাতেও পুস্তকখনি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের লোকেরা পাঠ করিতে পারিবেক।

5. Dr. Satish Chandra Banerji, M. A. D. L.,
PREMCHAND ROYCHAND Scholar.

I entirely agree with you in thinking that the methods adopted for the study of languages in this country are defective. Your own plan seems to have been carefully thought out, and it has been admirably worked out. I have no doubt that by following your method our boys will be able to pick up English and Sanskrit much more quickly that they do at present.

6. Babu Sarada Charan Mitra, M. A. B. L.,
PREMCHNAD ROYCHAND Scholar.

I have gone through the books *Ingraji Siksha* and *Sanskrita Siksha* and *Prachin Greecer Jatiya Siksha* of your 'Siksha Bijnan Series' and am of opinion that they will be of great help to those for whom they are intended. I am glad you are doing a great service in the art of teaching.

৭। গৌড়দূত—শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ, বি, এল্

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, মহাশয় এক বিশাল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই বলিলেও চলে। এদেশে জাতীয়ভাবে শিক্ষা প্রচার জন্য বিদ্যালয় ও পরিষৎ স্থাপিত হওয়ায় তাহার আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। বিনয়বাবু স্বয়ং এই শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী,

সুতরাং তিনি এই বিশাল কার্য্যে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সম্প্রতি এই বিরাট গ্রন্থের ভূমিকামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া একা বিনয়বাবুর দ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া অনেকে অসাধ্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং কেবল স্বয়ং প্রস্তুত নহেন, অপর সহচর ও সাহায্যকারী ব্যক্তিও প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিশাল গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

8. The Leader, *Allahabad, 13th October, 1911.*

Every lover of vernacular literature will welcome the nice little pamphlet 'The Man of Letters' from the pen of Prof. Benoy Kumar Sarkar, Lecturer in the Bengal National Council of Education. It sets forth in a forcible manner a scheme for the fostering of vernacular literature in India.

Prof. Sarkar holds that literature in common with everything else requires **protection** in its infancy. He says that our literature is still in its non-age and it is due to this backwardness and poverty of our language and literature that it has been only accorded a position of second language in the Government's scheme of higher education and has not been entitled to the dignity of the first language.

But this can be achieved if learned bodies like the Bangiya Sahitya Parishad of Calcutta and Nagri Pracharini Sabha of Benares undertake to employ some of the best students of our country to work together for the development of our literature under the guidance and control of such literary men as Dr. Seal of Bengal and Dr. Jha of our provinces. But to secure the services of these students it is essentially necessary that they should be free from all pecuniary wants.

The Bangiya Sahitya Parishad of Bengal took up the suggestion of Prof. Sarker and on the occasion of the fiftieth birthday anniversary of Babu Rabindra Nath Tagore, the greatest living poet of Bengal, have collected a decent fund the proceeds of which will be utilised in the manner indicated above.

The Nagri Pracharini Sabha of Benares can do the same. The Sabha can raise funds on similar occasions and spend them likewise. If this can be done, perhaps it will not be then too much "to expect that in the course of ten years we can have the best literary treasures of the world in our own national literature, that we can have the thoughts and investigations of Plato, Herbert Spencer, Guizot, Hegel and other European philosophers through the

medium of our own language, and that in no time the education of these provinces can grow into one that is natural and really national."

৯। প্রতিভা—ঢাকা

বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃত শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রথম গ্রন্থাবলী। ইতিপূর্ব্বে আর এরূপ গ্রন্থ রচিত হয় নাই। মাতৃ-ভাষা শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে প্রথম হইতেই বাক্যরচনা ও পদযোজনা লইয়া শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। শুদ্ধ বাক্যগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে অশুদ্ধ বাক্যকে শুদ্ধ করিবার প্রয়াস করিতে হইবে। প্রথমতঃ কেবল শুদ্ধবাক্য প্রয়োগ করিয়া শিক্ষার্থীর কর্ণকে শুদ্ধ বাক্যের ধ্বনিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

অধ্যাপক সরকারের প্রবর্ত্তিত পাঠ-সন্নিবেশের পারম্পর্য্য বিজ্ঞানসম্মত এবং আরোহ-প্রণালীর প্রয়োগমূলক। ব্যাকরণ শিক্ষা ব্যতিরেকে এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী অতি সহজে সংস্কৃত অনুবাদ ও রচনা-পদ্ধতির এবং সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

পাঠগুলি এত সুন্দর ধারাবাহিকরূপে ও ব্যবহারিকভাবে বিন্যস্ত যে ব্যাকরণের অতি জটিল সূত্র-নিয়ন্ত্রিত এবং বিভক্তি-ও-রূপ-বহুল সংস্কৃত ভাষা অতি সরলভাবে (এবং রূপ-ও-বিভক্তিহীন ভাষার ন্যায়) অনায়াসে আয়ত্ত হইতে পারে। ইহা গ্রন্থকারের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচায়ক।

সংস্কৃতশিক্ষার সৌকর্য্যসাধনে অধ্যাপক সরকারের পুস্তিকাবলী

তজ্জাতীয় আধুনিক গ্রন্থনিচয় অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট ও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর কত উপযোগী তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারেন। যুগধর্ম্মের ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং শিক্ষাদানের প্রাচীন প্রণালী বর্ত্তমানকালে আর প্রযোজ্য নহে। পণ্ডিতবর্গ ইহা বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক সরকারের প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে শিক্ষাকার্য্য সাধন করিবেন, ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

গভর্ণমেণ্ট-প্রস্তাবিত প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে এই প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে কি না তাহার বিচার হওয়া উচিত।

ইংরাজী শিক্ষা:—এরূপ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় বিরল না হইলেও মাতৃভাষার সাহায্যে লিখিত ঈদৃশ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন। সংস্কৃত শিক্ষাদান প্রণালীর ন্যায় এগুলিও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্ত্তক এবং ধারণা ও স্মৃতিশক্তির অপব্যবহার-নিবারক।

মৌখিক শিক্ষা হইতে শিক্ষার্থী ক্রমশঃ বাক্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে অগ্রসর হইবে। ইতিমধ্যে আপন আপন বেষ্টনী মধ্যে প্রয়োক্তব্য ইংরাজী শব্দ লইয়া ইংরাজী বাক্যে সেই সেই শব্দের ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপে বিনা আয়াসে বিভিন্ন জাতীয় সাধারণ পদার্থের সহিত পরিচিত হইয়া শিক্ষার্থী সরলবাক্য-রচনার কৌশল আয়ত্ত করিবে। মৌখিক শিক্ষাকালেই প্রশ্নোত্তর এবং আদেশ সম্বন্ধীয় বাক্যে শিক্ষার্থী অভ্যস্ত হইবে।

পাঠবিন্যাসগুলি ধারাবাহিক ও ক্রমিক। এই প্রণালীতে শিক্ষাদান করিলে স্বল্পায়াসে সুফল লাভ হইবে। প্রথমভাগের

দ্বিতীয় অনুশীলনে উচ্চারণ-বিষয়ক পাঠগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারে আসিবে। দ্রষ্টব্যাংশগুলি গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক এবং শিক্ষকের পক্ষে মূল্যবান্।

10. Empire—23rd September, 1911.

All students of Sanskrit language and literature should note the improvements made by Professor Sarkar, and educational authorities may see their way to give a **fair trial to his method** of teaching in the schools under their jurisdiction.

The author's "Prachin Greecer Jatiya Siksha' is in some respects a unique production in Bengali. It contains an excellent introduction to the science of education. Then follows an account of the systems of education which obtained in Sparta and Athens. In the concluding chapter ancient Greece and India have been compared from several points of view.

Professor Sarkar's volume is an **important contribution to Bengali literature** and should be bought in hundreds. We understand that all profits arising out of the sale of this book will go to the funds of the Bangiya Sahitya Parishad, the leading literary society of Calcutta.

১১। হিতবাদী—৭ই আশ্বিন, ১৩১৭ সাল

এ পুস্তকের আলোচনাপদ্ধতি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবর্গের মধ্যে ইহার আদর হইবে।

12. The Bengalee, September, 1910.

A MONUMENTAL WORK.

"*Shiksha Bijnaner Bhumica*" or Introduction to the Science of Education contains an appreciative preface by **Babu Hirendranath Datta,** is to be a *comprehensive* work treating of all the aspects of education, *historical*, *theoretical* and *practical*.

*   *   *   *   *

It is highly desirable that the **New Method of Teaching** inaugurated in his work should find its trial in our Public Schools and Colleges.

Government is also alive to the cause of primary education. It is evident that we are in need of number of educated men, like the present author, who can devote their lives to lift and leaven the gereral mass of the community.

Slur is often flung at our graduates that they are not fit for any original work. We invite the public to take note of this comprehensive and **original work** on the Science of Education and to see if they can adopt its ideals and methods of education.

The author deserves the most hearty thanks from the public for the long and steady efforts that are being made to the **cause of educational reform.**

১৩। প্রবাসী—ভাদ্র ১৩১৭

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকার এক প্রকাণ্ড পুস্তক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত করিবেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আলোচনা থাকিবে। সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যদেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থির করিবার চেষ্টা হইবে। শিক্ষার অন্তর্গত জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে। সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারমর্ম্ম প্রকাশ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকার বিদ্বান্ ও শিক্ষাকর্ম্মে ব্যাপৃত। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে আশা করা যায়। পুস্তিকার শেষে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দেশহিতেচ্ছুর চিন্তা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"শীঘ্রই বিদ্যাদান এবং শিক্ষাবিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজহিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্ম্মিগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায়ক জ্ঞানমন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করিবেন এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষাপ্রচারই

সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন। এরূপ সন্ন্যাসী দেশে দেখা দিয়াছেন।"

১৪। বসুমতী—ভাদ্র ১৩১৭

গ্রন্থকার "শিক্ষাবিজ্ঞান" নামক বিশখণ্ডে সমাপ্ত যে বিরাট গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই ভূমিকা তাহারই পরিচয় ও নির্ঘণ্টস্বরূপ লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান গ্রন্থ বঙ্গভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থকার মাতৃভাষায় এই অভাব দূর করিবার জন্য তিনি চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের রচনা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ। সংস্কৃত, ইংরাজী, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত চারি পাঁচখানি পুস্তক ইতিমধ্যেই যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

এই রাজনীতিক আন্দোলনের দিনে শিক্ষাবিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া নবীন গ্রন্থকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবুর সহিত আমরাও বলি—সুধীমণ্ডলী এই নূতন গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিবেন এবং শিক্ষাবিষয়ে নিজ নিজ চেষ্টা ও চিন্তার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত "বিজ্ঞানের" প্রতিষ্ঠা করিবেন।

১৫। ভারতী—কার্ত্তিক ১৩১৭

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গ্রন্থকারের যোগ্যতা, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ মহৎ অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে সবিশেষ আশান্বিত, আমরাও তদ্রূপ আশান্বিত।

গ্রন্থকার শিক্ষাব্রতে আপনার সকল চিন্তা, সকল চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন, শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকাপাঠে গ্রন্থকারের শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। এমন পাণ্ডিত্য ও তাহার সদ্ব্যবহার আজিকালকার এ স্বার্থের যুগে দুর্লভ, প্রাচীন ভারতের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক, শিক্ষার প্রকৃষ্টতর আদর্শে বাঙ্গালী উন্নতির পথে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

16. The Modern Review—*October, 1910.*

The author is engaged in the preparation of a 'Science of Education Series' which will be completed in twenty parts. The book under review is an introduction to the whole series. The author deserves our best thanks for the services he is doing to the cause of **Educational Reform** in our country, and we recommend this introduction to our teachers for perusal.

১৭। আর্য্যাবর্ত্ত—কার্ত্তিক ১৩১৭

আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্ব্বাভাষ বা অবতরণিকা। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমোন্নতিদর্শনে, কোমত্ তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণী-বিভাগে যে একটী ভাবসমগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন,

তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রতা নহে। 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন; জীবনব্যাপিনী সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করা যায় কিনা সন্দেহ। ভূমিকার ভূমিকালেখক হীরেন্দ্রবাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশ্য শিক্ষাবিজ্ঞানের গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই।

সমস্ত জড়বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষায় সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না। শিক্ষাবিজ্ঞান-আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কায করিয়াছেন। বাঙ্গাল্য ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এখন সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অনুকূল নহে; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান্, সুন্দর এবং সার্থক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি। * * *

বিষয়ের গুরুত্ব তুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র; তাহা হইলেও লেখক যেরূপ ভাবে তাঁহার বক্ষ্যমান বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা হইতেই তদীয় আরব্ধ ব্যাপারটীর ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার ক্ষমতারও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কামনা, তিনি নিজব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

18. THE HINDUSTHAN REVIEW—Allahabad.

Professor Benoy Kumar Sarkar's *Economics* in his *Aids to General Culture Series* an exposition of the science as conceived in Europe from Adam Smith to Marshall, but the last chapter "*The Meaning of Indian Economics—Different standpoints*" is bound to prove not only interesting but instructive to students in the country. In this the author gives a lucid summary of the different standpoints from which the subject may be studied.

He distinguishes between what passes for Indian Economics in the curriculum of our study of our present-day facts and phenomena relatng to the industrial, financial and commercial organisaation of the society and the position the subject should have as a contribution to the universal science of Economics, which is yet in the making according to the principles of the inductive-philosophical method. According to this view Indian Economics *as an applied science* should mean not an Economic History as set forth by Mr. Romesh Dutt or a summary of what is available in the Economic and Administrative sections of the *Imperial Gazetteer of India*, but a study of the methods aud means of the socio-economic and economico-political advancement of India.